সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

مجلة

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৪৫-৪৬

২৫ আগস্ট ২০২৫

সোমবার

মাসজিদ বাব আস সালাম, ওমান

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা

যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ’র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

✱ বর্ষ : ৬৬
✱ সংখ্যা : ৪৫-৪৬
✱ বার : সোমবার

◈২৫ আগস্ট-২০২৫ ঈসায়ী
◈১০ ভাদ্র-১৪৩২ বাংলা
◈০১ রবিউল আউয়াল-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযন্‌ফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ
সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-২২৪৪৫৮৫৫১

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

۹۸ نواب فور، داكا-۱۱۰۰.

الهاتف: ۰۲۷٥٤۲٤۳٤، الجوال: ۰۹۳۳۳٥٥۹۰۱

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

✍ সম্পাদকীয় ০৩

✍ আল কুরআনুল হাকীম :
❖ ঈমানের প্রকৃত রূপ ও মু'মিনের পরিচয়
আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪

✍ হাদীসে রাসূল ﷺ :
❖ দু'টি উত্তম কাজ
গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭

✍ প্রবন্ধ :
❖ ঈদে মীলাদুন্নাবী : পরিচয়, উৎপত্তি, শরয়ী হুকুম ও করণীয়
আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ- ১০
❖ কিয়ামতের পূর্বাভাস : অদ্ভুত পশু দাব্বাতুল আরয
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী- ১৪
❖ হাদীসের গুরুত্ব এবং সহীহ ও জাল হাদীসের প্রামাণিকতা
কে. এম আব্দুল জলিল- ১৬
❖ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ)
মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন- ২২

✍ ক্বাসাসুল হাদীস :
❖ খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৪

✍ বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস :
❖ মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে 'আমল বাতিল?
আরাফাত ডেস্ক- ২৫

✍ বিশেষ প্রতিবেদন :
❖ পুশইন সংকটে বাংলাদেশ
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৬
❖ দেশ ভাগ-১৯৪৭ : প্রেক্ষিত ও প্রভাব
মো. মজিবুর রহমান- ২৮

✍ সমাজচিন্তা :
❖ টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার; ইসলাম কী বলে?
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ৩১

✍ আত্মগঠন :
❖ কর্মের অপারগতা
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ৩৬

✍ নিভৃত ভাবনা :
❖ মৃত্যুর প্রস্তুতিতে তাওবাহ্-ইস্তিগফার
জান্নাতুল মহল- ৩৯

✍ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :
❖ বিজ্ঞানের অবদান
ইসরাত পারভীন মৌসুমী- ৪৩

✍ কিশোর ভুবন :
❖ মাকড়সা ও মহান আল্লাহর ওপর ভরসা
আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৫

✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪৬

☐ প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

আদর্শ সমাজ গড়তে চাই নৈতিক গুণে গুণান্বিত নেতৃত্ব

আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর মানুষকে তাওহীদের উপর এক ও অভিন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এই মহৎ লক্ষ্য পূরণের জন্য তিনি যুগে যুগে বেছে নিয়েছেন যোগ্যতম ব্যক্তিকে– যাদেরকে তিনি নবী ও রাসূল বানিয়েছেন। তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন ঈমানের প্রদীপশিখা, সমৃদ্ধ করেছেন সময়োপযোগী হেদায়েতবাণীতে। তাঁরা জাতিকে দিয়েছেন দিকনির্দেশনা, দেখিয়েছেন ন্যায়ের পথ, আর প্রতিকূলতার অন্ধকারে থেকেও অবিচল থেকেছেন নীতি ও আদর্শে। তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য জাতিকে করেছে বিমোহিত; আর মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ পেয়েছে সত্যের সন্ধান, জীবনে এনেছে আলোর দিশা।

সর্বজনবিদিত সত্য হলো– কোনো ইসলামী দল, জাতি কিংবা সংগঠন পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্বই হলো তার প্রাণশক্তি। যোগ্য নেতৃত্ব পেলে জাতি সুনিয়মে, সুসংগঠিতভাবে লক্ষ্যপানে এগোতে থাকে। বিপরীতে, যদি নেতৃত্ব হয় অন্তঃকেন্দ্রিক কিংবা দূরদর্শিতাহীন, তবে তা হয়ে দাঁড়ায় জগদ্দল পাথরের মতো ভারী বোঝা। তখন জাতি হয় বিপর্যস্ত, লক্ষ্যচ্যুত হয় আদর্শ। তাই নেতৃত্ব নির্বাচনে জাতিকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে প্রজ্ঞাবান, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে– যাঁর নেতৃত্ব জাতিকে সফলতার দিগন্তে পৌঁছে দেবে।

কারণ নেতা মানে শুধু পদ অলঙ্কার নয়; নেতা মানে পরিকল্পনাকারী, দিকনির্দেশক ও সঙ্কটকালে সাহসী সিদ্ধান্তদাতা। নেতা দক্ষভাবে কর্মপরিকল্পনা বণ্টন করবেন, কর্মীদের সম্ভাবনা জাগ্রত করবেন এবং তাঁদের হাত দিয়েই বাস্তবায়ন করবেন মহৎ কাজ। এতে যেমন দক্ষ কর্মীশক্তি তৈরি হবে, তেমনি দ্রুত হবে সমস্যা সমাধান। কিন্তু যদি নেতা নিজেকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেন– বাজারে তিনি, মঞ্চে তিনি, মিম্বারে তিনি, অফিসে তিনি, সাক্ষাৎকারে তিনি, মিডিয়ায় তিনি, মাদরাসায় তিনি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই; মুখপত্রে, মূল কমিটিতে, উপকমিটিতে, সাব কমিটিতেও কেবল তিনিই– তবে তা নেতৃত্ব নয়; বরং এক "ওয়ান ম্যান শো", যেখানে সংগঠন থাকে অনুপস্থিত– এমন নেতৃত্ব কাম্য নয়। কেননা তা আধিপত্যবাদ জন্ম দেয়। এই ধরনের কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্ব নিজেকে টিকিয়ে রাখতে অনৈতিক ও খারাপ চরিত্রের মানুষগুলোকে নিজের আশে পাশে স্থান দিয়ে, নেতৃত্বকে আরো কুক্ষিগত ও স্থায়ী করতে চায়। আর তখন তারা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তিনিই যুগে যুগে জালিমের অবসান ঘটিয়েছেন।

জাতীয় সংসদও একই সূত্রে বাঁধা। সংসদ সদস্যগণ সংবিধানের আলোকে নীতি নির্ধারণ করবেন, দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেবেন– এটিই তাঁদের দায়িত্ব। কিন্তু তাঁরা যদি হয়ে ওঠেন আইনরক্ষক, শাসক, প্রশাসক, সমাজপতি, এমনকি টেন্ডারবাজি কিংবা ক্ষমতার দখলদার– তবে দেশ কখনো সঠিক পথে এগোতে পারবে না; বরং দল বা ব্যক্তির অতিরিক্ত শক্তি সমাজকে তটস্থ করে তুলবে। এমন নেতৃত্ব পরবর্তী প্রজন্মকে টেনে নেবে ধ্বংসের অতলে, জাতিকে পরিণত করবে নৈতিক শূন্যতায়। ইসলামী দল বা সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রেও চিত্রটি ভিন্ন নয়– যোগ্য নেতৃত্ব না থাকলে সেখানে জন্ম নেবে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য।

অতএব, সঠিক আসনে বসাতে হবে যোগ্যজনকে। আর সে নির্বাচন নির্ভর করবে জাতির দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ওপর। কেননা, নেতৃত্বই জাতির দিকনির্দেশক, নেতৃত্বই জাতির আলোকবর্তিকা। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

ঈমানের প্রকৃত রূপ ও মু'মিনের পরিচয়

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"মরুবাসী (বেদুঈন)-গণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম। (হে রাসূল! আপনি) বলুন : তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো– আমরা ইসলাম গ্রহণ (আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

قَالَتِ -সে বলল, الْاَعْرَابُ -মরুবাসী (বেদুঈন), اٰمَنَّا - আমরা ঈমান এনেছি, قُلْ -আপনি বলুন, لَّمْ تُؤْمِنُوْا - তোমরা ঈমান আননি, وَلٰكِنْ -কিন্তু/বরং, قُوْلُوْۤا -তোমরা বলো, اَسْلَمْنَا -আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, وَ - আর/এবং, لَمَّا يَدْخُلِ -এখনো প্রবেশ করেনি, الْاِيْمَانُ - ঈমান, فِيْ -মধ্যে, قُلُوْبِكُمْ -তোমাদের অন্তরসমূহ, وَ - আর/এবং, اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ -যদি তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, وَرَسُوْلَهٗ -এবং তাঁর রাসূলের, لَا يَلِتْكُمْ -তোমাদের কম করা হবে না, مِّنْ -হতে/ থেকে, اَعْمَالِكُمْ - তোমাদের কর্মসমূহ, شَيْـًٔا -কিছুই/সামান্য পরিমাণ, اِنَّ -নিশ্চয়ই, اللّٰهَ -আল্লাহ, غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৪।*

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কোরআনুল কারীমের ৪৯ নম্বর সূরা, সূরা আল-হুজুরা-ত-এর ১৪ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি কোরআনুল কারীমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এ আয়াতে মরুবাসী বেদুঈনদের অসার বক্তব্য উপস্থাপন করত তা খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا﴾

"মরুবাসী (বেদুঈন)-গণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম।"

ব্যাখ্যা : কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে এখানে মরুবাসী (বেদুঈন)-গণ বলে বানু আসাদ এবং খুযাইমাহ্ গোত্রের মুনাফিক্বদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা দুর্ভিক্ষের সময় শুধু সাদাক্বাহ্ পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু তাদের অন্তর ঈমানশূন্য ছিল।[২] কেউ কেউ আবার মনে করেন এখানে বেদুঈন বলে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা নতুন মুসলমান হয়েছে এবং ঈমান এখনো তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থান পায়নি। অথচ তারা দাবি করেছিল ততটা ঈমানের যতটা তাদের অন্তরে ছিল না। ফলে তাদেরকে শিখানো হলো যে, প্রথমেই ঈমানের দাবি করা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে উন্নতি লাভের পরই তোমরা ঈমানের সেই কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌছতে পারবে।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ﴾

[২] *তাফসীর ফাতহুল কাদীর।*

[৩] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

"(হে রাসূল! আপনি) বলুন : তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো– আমরা ইসলাম গ্রহণ (আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতাংশে সে সকল বেদুঈনের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলামে দাখিল হওয়া মাত্রই বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিজেদের ঈমানের দাবি করতে শুরু করেছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়নি। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে এই দাবি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (ﷺ)-কে বলছেন : হে নবী (ﷺ)! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, যেহেতু ঈমান তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেনি সেহেতু তারা ঈমান এনেছে একথা যেন না বলে; বরং তারা যেন বলে যে, তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং নবী (ﷺ)-এর অনুগত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা এটা জানা যায় যে, ঈমান ইসলাম হতে মাখসূস বা বিশিষ্ট আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। হাদীসে জিবরা-ঈলও এটাই প্রমাণ করে। তিনি (জিবরা-ঈল [আলায়হিস সালাম]) প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং পরে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ইহসান সম্পর্কে। এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে বিশিষ্টের দিকে ওঠতে থাকেন।

সুতরাং বুঝা গেল, ইসলাম থেকে ঈমান খাস বা বিশিষ্ট। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায় না; বরং মু'মিন হতে হলে তাকে ধীরে ধীরে ঈমানের পথে এগিয়ে যেতে হয়। ঈমানের কয়েকটি স্তর রয়েছে; পর্যাক্রমে সকল স্তর অতিক্রম করে ঈমানের প্রকৃত স্তরে পৌঁছতে হয়। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন : দুনিয়ায় তিন প্রকারের মু'মিন রয়েছে। **এক.** যারা মহান আল্লাহর ওপর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ওপর ঈমান এনেছে, অতঃপর কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের মাল-ধন ও জীবন দিয়ে মহান আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। **দুই.** যাদের থেকে লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। তারা না তাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, না তাদেরকে হত্যা করে। **তিন.** যারা লোভনীয় বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়ার পর মহামহিমান্বিত আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশে ইসলামে প্রবেশকারী আরব-বেদুঈনদের ঈমানকে পরিপূর্ণ করার পরামর্শ দিয়ে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করো তবে তোমাদের কর্ম সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। যেমন- অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَمَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ كُلُّ امْرِیٍٔۢ بِمَا كَسَبَ رَهِیْنٌ﴾

অর্থাৎ- "আমি তাদের 'আমল হতে কিছুই কমিয়ে দেইনি। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে।"[৪]

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

ঈমানের প্রকৃতরূপ ও মু'মিনের পরিচয় : দরসে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে আরব-বেদুঈনদের ঈমানের অসার দাবির কথা উল্লেখ করে ঈমানের প্রকৃতরূপ ও মু'মিন হওয়ার জন্য তাদের করণীয় কী তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা দাবি করেছিল যে, তারা মু'মিন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন কারা সে জ্ঞান তাদের ছিল না। তারা মনে করেছিল, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি প্রকৃত মু'মিন হওয়া যায়। তাই তারা নিজেদের ঈমানের দাবি করেছিল, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের সে ঈমানের দাবিকে গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ﴾

অর্থাৎ- "(হে রাসূল! আপনি) বলুন : তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বলো– আমরা ইসলাম গ্রহণ

[৪] *সূরা আত্-তূর : ২১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

(আত্মসমর্পণ) করেছি; কারণ এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

এরপর তিনি তাদেরকে প্রকৃত মু'মিন কিভাবে হওয়া যায় তার দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলছেন–

﴿وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا﴾

অর্থাৎ- "আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না।"

সুতরাং প্রকৃত মু'মিন হতে হলে আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ নিজেকে প্রকৃত মু'মিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাছাড়া মু'মিন হওয়ার জন্য আরো কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা এভাবে পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾

অর্থাৎ- "মু'মিন তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর তাতে কখনো কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তারা তাদের নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে।"[৫]

অতএব, বুঝা গেলো, এ সকল কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়েই একজন মুসলিম নিজেকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করতে পারে। কেউ যখন ঈমানের স্বাদ প্রকৃতরূপে অনুভব করে তখন সে আর ঈমান ও 'আমলের পথে কোনো বাধাকেই পরোয়া করে না। সকল বাধাই তখন তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সে সকল কিছুর ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্থান দিয়ে থাকে। প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেতে চাইলে কী করণীয়? হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يكره أَن يلقى فِي النَّار.

অর্থাৎ- আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোকের মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পায়। (১) তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা দুনিয়ার সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হয়। (২) যে লোক কোনো মানুষকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসে। (৩) যে কুফ্‌রী হতে মুক্তি পেয়ে ঈমান ও ইসলামের আলো গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যাওয়াকে এতটা অপছন্দ করে যতটা অপছন্দ সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে করে।[৬]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

এক- ঈমান শুধু মৌখিক দাবিতে নয়; বরং ঈমানের পথে প্রতিনিয়ত চেষ্টা-সাধনা করতে হয়।

দুই- প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো বিধান-বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ না করা এবং জান-মাল দিয়ে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যিক।

তিন- ঈমানদারদের সকল কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হয়। তা যত সামান্যই হোক না কেন, তার প্রতিফল বিনষ্ট করা হয় না।

চার- যারা ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান রাখে না তারাই কেবল ঈমানের অসার দাবি করতে পারে। প্রকৃত ঈমানদারেরা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করে না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তারা তাদেরকে সমর্পণ করে ঈমানের পরিচয় দেয়।

পাঁচ- একজন মু'মিনের নিকট ঈমান শুধু মৌখিক দাবি নয়; বরং ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের সত্যায়ন ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম। ☒

[৫] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৫।*

[৬] *বুখারী- হা. ২১; মুসলিম- ৪৩; নাসায়ী- হা. ৪৯৮৮; তিরমিযী- ২৬২৪; ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০৩৩; আহমাদ- ১২৭৬৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

দু'টি উত্তম কাজ

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (رضي الله عنه) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

হাদীসের সরল অনুবাদ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ কাজ উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খানা খাওয়াবে এবং তুমি যাকে চেন এবং যাকে চেন না সবাইকে সালাম দেবে।[৭]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। পিতার নাম 'আম্র ইবনুল 'আস। মাতার নাম রীতা বিনতুল মুনাব্বিহ। তাঁর বংশধারা হলো– 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস ইবনু ওয়ায়েল ইবনে হিশাম ইবনু সুয়াইদ ইবনে সাহাম ইবনু 'আম্র ইবনে হোসাইন ইবনু ক্বা'ব ইবনে লুয়াই ইবনু গালিব আল করশিস সাহমী। তাঁরা কুরাইশ বংশের একটি শাখা বংশ। তিনি স্বীয় পিতা 'আম্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সুদক্ষ কূটনীতিক। পিতা ও পুত্র উভয়ই মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করেন। মহানবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তাঁর পিতা স্বীয় নেতৃত্বের ঝাণ্ডা পুত্র 'আব্দুল্লাহ'র হাতে তুলে দেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্যতম এবং 'আব্দুল্লাহ নামের ফকীহগণের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৭০০ মতান্তরে ৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ১৭টি। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮টি এবং ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন ২০টি। তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবুদ দারদা, মু'আয ও 'আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আবূ উমামাহ্, মিসওয়ার, সায়েব ইবনু ইয়াযিদ, আবুত তুফায়েল, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, আবূ সালামাহ্, 'আত্বা, মুজাহিদ, 'উরওয়াহ্ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

তাঁর ইন্তেকালের স্থান ও সন সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেন, তিনি হিজরি ৬৩ সনে মদিনায় 'হাররা' যুদ্ধকালে কোনো এক রাতে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে, ৭৩ হিজরিতে অথবা ৬৭ হিজরিতে অথবা ৫৫ হিজরিতে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে ইসলামের দু'টি উত্তম কাজের কথা বলা হয়েছে– **১.** ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো। **২.** পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে সালাম প্রদান।

১. ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো : হাক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দান করা। ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তি সব দিক দিয়ে দুর্বল হয়, খাবারের অভাবে সে অসহায় ও অচল হয়ে পড়ে। তাই ক্ষুধার্তকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় 'আমল। মানুষকে খাওয়ানো, অনাহারীর আহারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর একটি। এ কারণেই ইসলাম ধর্মে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করাকে উত্তম ইসলাম বলা হয়েছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে, তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাদের সুনাম করেছেন, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝ فَوَقٰهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا﴾

"নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে, যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন এক ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্রাসা, গাইবান্ধা।*

[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২; সহীহ মুসলিম- হা. ৩৯।*

বান্দারা পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তারা মানত পূর্ণ করে এবং সে দিনকে ভয় করে, যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত। তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকরও না। আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি। সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।"[৮]

অনেকে মনে করতে পারে, আমার সামর্থ্য নেই, আমি কোত্থেকে খাওয়াব? আমি নিজেই তো অভাবে আছি। তাদের উদ্দেশে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ○ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ﴾

"অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। এতিম আত্মীয়-স্বজনকে। অথবা ধূলি-মলিন মিসকিনকে। অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় দয়া-অনুগ্রহের। তারাই সৌভাগ্যবান।"[৯]

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান এমন একটি 'আমল, যার দ্বারা একজনের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হয়। কারণ ক্ষুধার্তকে দান করে নিঃস্ব মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। আর এতে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য লাভ করা যায়। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে লোক তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন।[১০]

২. পরিচিত-অপরিচিত মানুষকে সালাম প্রদান : সালাম ইসলামী সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি পারস্পরিক সম্ভাষণ, একটি দু'আ এবং একে অপরকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার। 'সালাম' অর্থ শান্তি। পরস্পর সালাম বিনিময়ের অর্থ তারা নিজেদের মাঝে শান্তি, সৌহার্দ্য স্থাপনে আগ্রহী। অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন চিন্তা কথা ও কাজ থেকে তারা বিরত থাকবে। আল্লাহ বলেন–

﴿وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا﴾

"যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়) তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করো অথবা অনুরূপ করো।"[১১]

'সালাম' আরবী শব্দ। অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, অভিবাদন ইত্যাদি। 'সালাম' আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে সালাম প্রদানের গুরুত্ব, নিয়ম-নীতি ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ মুসলিমদের মধ্যে সালামের প্রচার-প্রসার ইসলামের একটি মহান ঐতিহ্য ও বিশেষ সৌন্দর্য। আর পরস্পর সালাম বিনিময় করা একজন মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার ও দায়িত্ব।

সালাম অহংকার দূর করে বিনয় সৃষ্টি করে। কেননা অহংকার পতনের মূল। গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি বিনয়, ভদ্রতা-নম্রতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণে সাহায্য করে। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পছন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। আল্লাহ বলেন–

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ﴾

"যমীনে গর্বভরে চলো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী দাম্ভিককে ভালোবাসেন না।"[১২]

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ.

'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'[১৩]

সুতরাং এ অহংকার নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচতে চাইলে, আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে এবং জান্নাত লাভের বাসনা করলে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে।

প্রথমে সালাম প্রদানকারী গর্ব-অহংকার থেকে যেমন মুক্ত থাকে তেমন বিনয়ীও হতে পারে। বিনয় মহান আল্লাহর গজব হতে রক্ষা করে তাঁর রহমতের অধিকারী বানায়। অহংকার ব্যক্তিকে কলুষিত করে আর বিনয় মানুষের জীবনকে পবিত্র করে। অহংকার শত্রুতা সৃষ্টি করে আর বিনয় শত্রুকেও পরম বন্ধুতে পরিণত করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অহংকার নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য সালামের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া।

আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি হতে হলে সালাম দেওয়ার ব্যাপক প্রতিযোগিতা করতে হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

---

[৮] *সূরা আদ্ দাহ্‌র : ৫-১১।*
[৯] *সূরা আল বালাদ : ১৪-১৮।*
[১০] *মুসলিম- হা. ২৬৯৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২০৪।*
[১১] *সূরা আন্-নিসা : ৮৬।*
[১২] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৮।*
[১৩] *সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫১০৮।*

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.

সেই ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম যে প্রথমে সালাম প্রদান করে।[১৪]

দুই ব্যক্তির মধ্যে সালাম প্রদানে যে অগ্রবর্তী হবে, আল্লাহর নৈকট্য ও অনুগ্রহ লাভেও সে অগ্রবর্তী হবে। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও অনুগ্রহলাভে অধিক অগ্রবর্তী সেই ব্যক্তি, যে (অপর মুসলিমকে) সালাম প্রদানে অধিক অগ্রবর্তী।[১৫]

আরেক হাদীসে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ.

সালাম প্রদানে অগ্রবর্তী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত।[১৬]

অর্থাৎ- সালাম প্রদানে অগ্রবর্তী হওয়া একথা প্রমাণ করে, উক্ত ব্যক্তির অন্তরে অহংকার নেই। অহংকার বান্দার জন্য একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় চরিত্র। বিনয় মু'মিনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। পারস্পরিক সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালামের অভ্যাস অহংকার দূরীকরণে এবং বিনয় অর্জনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সালাম দেওয়ার পদ্ধতি : ইসলাম সালাম দেওয়া এবং নেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। এরপরও অজ্ঞতার কারণে আমরা ভুল করে থাকি। নিম্নে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

সালাম প্রদানকারী : যে আগে সালাম দেবে, সে নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম দেবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه **অর্থ :** তোমাদের ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।[১৭]

সালামের উত্তর প্রদানকারী : যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেবে সে বলবে– وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ **অর্থ :** তোমাদের ওপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।[১৮]

অনুপস্থিত ব্যক্তির সালামের উত্তর : অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি যদি সালাম প্রদান করে, তাহলে তার সালামের উত্তর এভাবে বলবে– عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ. **অর্থ :** তোমার এবং তার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক[১৯] অথবা শুধু বলবে– وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ. **অর্থ :** তার ওপর শান্তি ও মহান আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[২০]

উল্লেখ্য যে, সালামের জবাবের শেষে وَمَغْفِرَتُهٗ শব্দও যোগ করা যায়।[২১] তবে যে হাদীসে وَمَغْفِرَتُهٗ শব্দ যোগ করে চল্লিশ নেকি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সে হাদীসটি য'ঈফ।[২২]

সালামের সওয়াব : 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ (ﷺ) : عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيَّ (ﷺ) : عِشْرُوْنَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، فَقَالَ النَّبِيِّ (ﷺ) : ثَلَاثُوْنَ.

এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, عَشْرٌ (দশ) (অর্থাৎ- আগন্তুক ব্যক্তির 'আমলনামায় সালামের বিনিময়ে দশ নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, عِشْرُوْنَ (বিশ) (অর্থাৎ- তার 'আমলনামায় বিশ নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। এরপর তৃতীয় আরেক ব্যক্তি এসে বললেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ. আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)। তখন তিনি বললেন, ثَلَاثُوْنَ (ত্রিশ) (অর্থাৎ- তার 'আমলনামায় ত্রিশ নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)।[২৩]

শিক্ষণীয় বিষয়

এক. মানুষকে খাওয়াতে হবে শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

দুই. এর বিনিময়ে কখনো তাদের কাছে কোনো প্রতিদানের আশা করা যাবে না।

তিন. এবং এই আশাও করা যাবে না যে, তারা আমার গুণগান গাইবে।

চার. পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান।

পাঁচ. প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। ☒

---

[১৪] *মুসনাদ আহমাদ; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৪৬।*
[১৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৭।*
[১৬] *শু'আবুল ঈমান; বায়হাক্বী- হা. ৮৪০৭।*
[১৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৫।*
[১৮] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৬৩৩, সনদ সহীহ।*
[১৯] *বুখারী- হা. ৩২১৭, ৩৭৬৮; আহমাদ- হা. ২৪৯০১।*
[২০] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ১৪৪৯।*
[২১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২১৭, ৩৭৬৮; আহমাদ- হা. ২৪৯০১।*
[২২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৬।*
[২৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৫১৯৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

ঈদে মীলাদুন্নাবী : পরিচয়, উৎপত্তি, শরয়ী হুকুম ও করণীয়

–আবু মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

➡ **ভূমিকা :** ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিমদের যাবতীয় ‘ইবাদত, উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতা এই দু’টি মূল উৎসের ভিত্তিতে নির্ধারিত। ইসলাম কখনো এমন কোনো ‘আমলকে উৎসাহ দেয় না, যা রাসূল (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) পালন করেননি। আজকাল হিজরি বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে মুসলিম সমাজে “ঈদে মিলাদুন্নাবী” নামে একটি দিনকে ঈদ হিসাবে পালন করা হয়, যা নবী (ﷺ)-এর জন্মদিন হিসেবে পরিচিত। কিন্তু প্রশ্ন হলো– দিবসটি কি ইসলামী শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলিলসম্মত? রাসূল (ﷺ) নিজে কিংবা তাঁর সাহাবারা কি কখনো এই দিন পালন করেছেন? ইতিহাস ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঈদে মিলাদুন্নাবী পালনের প্রচলন বহু বছর পর চালু হয়েছে, যা ইসলামের মূল আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই এই প্রবন্ধে ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয়, উৎপত্তি, শরয়ী হুকুম ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

➡ **ঈদে মীলাদুন্নাবীর পরিচয় :** “ঈদে মীলাদুন্নাবী” একটি বহুল প্রচলিত পরিভাষা। এ নামটি তিনটি আরবী শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, শব্দ তিনটি হলো– (عيد) ঈদ, (ميلاد) মীলাদ, (النبي) নবী।

■ **(عيد) ঈদ-এর পরিচিতি :**

১. আভিধানিক অর্থ : ঈদ (عيد) শব্দটি আরবী, বহুবচনে أَعْيَاد; যার অর্থ- বারংবার ফিরে আসা, সমবেত হওয়া, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি।

২. পারিভাষিক অর্থ : ঈদ-এর সংজ্ঞায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أوبعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.

“ঈদ এমন সাধারণ সমাবেশ যা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে। বছর ঘুরে আসে, সপ্তাহে আসে অথবা মাসে আসে।”[1]

এ ঈদ সময় কেন্দ্রীক, আবার স্থান কেন্দ্রীকও হয়ে থাকে।

■ **(ميلاد النبي) মীলাদুন্নাবী-এর পরিচিতি :**

১. আভিধানিক অর্থ : ميلاد (মীলাদ) শব্দটি আরবী, যার অর্থ- জন্ম বা জন্মকাল, আর النبي (নবী) শব্দটি আরবী হলেও তা সকল মুসলিমের বোধগম্য। উদ্দেশ্য হলো নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)। সুতরাং “ঈদে মীলাদুন্নাবী”-এর অর্থ হলো নবীর জন্মে খুশি বা উসৎব।

২. পারিভাষিক অর্থ : নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্ম উপলক্ষে যে আনুষ্ঠানিকতা বা ঈদ উৎসব পালন করা হয় তাকে ঈদে মীলাদুন্নাবী বলা হয়।

সাধারণত, বর্তমানে ১২ রবিউল আউয়ালকে শেষ নবীর জন্মদিন ধরে কিছু সুবিধাবাদী আলেমের পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়াজ-নসীহত যিক্‌র-আযকার ও ক্বিয়াম করে পরিশেষে মিষ্টিমুখ করে যে অনুষ্ঠান ত্যাগ বা সমাপ্ত করা হয়, সেটাই হলো ঈদে মীলাদুন্নাবী।

➡ **ঈদে মীলাদুন্নাবী-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :** “ঈদে মীলাদুন্নাবী” অনুষ্ঠানাদির ভিত্তি কুরআন ও সহীহ হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যায়, প্রাক ইসলামী যুগেও এ জাতীয় আচার অনুষ্ঠান ছিল, যেমন- গ্রীক, ইউনান, ফিরায়ানা ইত্যাদি। সভ্যতায় তারা স্বীয় দেবতার অনুষ্ঠান উদযাপন করত। তাদের থেকে গ্রহণ করেছে তাদের পরবর্তী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। যাদের কাছে বড় ঈদ হলো তাদের নবীর জন্মোৎসব পালন করা। খ্রিষ্টানদের জন্মোৎসব বা বড় দিবসের অনুষ্ঠান শুধু প্রাক ইসলামেই পালন করা হত না; বরং আজও হয়ে চলছে, সেখান থেকেই অনুসৃত হয়ে মুসলিম সমাজে এসেছে।

এখন প্রশ্ন হলো– **কখন থেকে মুসলিম সমাজে এ অনৈসলামিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটল এবং কার মাধ্যমে ঘটল?**

*‘আক্বীদাহ্ ও দা’ওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

[1] ঈদে মীলাদুন্নাবী- ড. শহীদুল্লাহ খাঁন মাদানী, পৃ. ৪।

■ **সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপন :** ঈদে মীলাদুন্নাবী-এর পক্ষে ও বিপক্ষে সকল আলেম সমাজ একমত যে, এ মীলাদুন্নাবীর উৎসব নবী, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের মাধ্যমে কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে অবশ্যই সে উত্তম যুগসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পরই এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু কোন সময় এবং কার মাধ্যমে এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটল এ নিয়ে ইসলামী পণ্ডিতগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন :

এক. হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষে সর্বপ্রথম মিসরে ফাতেমী সম্রাজ্যে এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটে। তারা সর্বপ্রথম ছয়জন ব্যক্তির জন্মোৎসব পালন করেন। তারা হলেন : **১.** নবী, **২.** 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), **৩.** হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) **৪.** হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু), **৫.** ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা), **৬.** তৎকালীন ফাতিমী সম্রাজ্যের খলীফা।

তখন হতে ফাতেমী বা শিয়া সম্প্রদায়ের খলীফা স্বউদ্যোগে জাতীয়ভাবে ছয় জনের জন্মদিবস পালন করতেন।[১]

দুই. হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরাকের মাওসুল শহরে তৎকালীন বাদশা আল মুযাফ্‌ফার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী আলেম 'উমার ইবনু মুহাম্মাদ মল্লা-এর পরিচালনায় সর্বপ্রথম নবী (ﷺ)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।[২]

ইমাম আবূ শামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত দু'টি মতের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেন, বস্তুত সর্বপ্রথম যারা এ বিদ'আতের উদ্ভব ঘটায় তারা হলো– ফাতিমী বা শিয়া সম্প্রদায়। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে তারা মিসরের রাজধানী কায়রোতে এ বিদ'আতের আবির্ভাব ঘটায়। অতঃপর সেখান থেকে ফাতিমী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইরাকের মধ্যে মাওসুল শহরে সর্বপ্রথম বাদশা মুযাফ্‌ফার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিদ'আত চালু হয়। যদিও অন্য অঞ্চলে তা আগেই উদ্ভব হয়েছিল কিন্তু ইরাকে মাওসুল শহরে তার মাধ্যমেই প্রথম চালু হয়।[৩]

আরেক বর্ণনা মতে, ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্নর আবূ সা'ঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরিতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরিতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের নামে নাচ-গানসহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হতো। গভর্নর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্তাব 'উমার ইবনু দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানোয়াট হাদীস জমা করে বই লেখেন এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[৪]

➡ **ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করার শারয়ী হুকুম :** ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করেননি এবং করতেও বলেননি। চার খলীফাসহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীরা কেউ এ অনুষ্ঠান পালন করেননি। লক্ষাধিক সাহাবীর কোনো একজনও এ উৎসব পালন করেননি। পরবর্তী যুগের তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণও পালন করেননি। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ হাদীসগ্রন্থ সংকলনকারী মুহাদ্দিসগণও পালন করেননি। এমনকি চার মাযহাবের ইমামগণের কোনো একজনও এ ঈদ পালন করেননি।[৫] তাঁরা কেউ পালন করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায়, ঈদে মীলাদুন্নাবী নতুন আবিষ্কার। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন। এ দ্বীন পরিপূর্ণ বিধায় আমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিদ'আত থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিদ'আতকারীর ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৬]

তিনি আরো বলেন,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

---

[১] আল খিতাত লিল মাকরীযী- ১/৪৯০-৪৯৯।

[২] হাসনুল মাকসাদ লিস সুয়ূতী- পৃ. ৪২; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ১৩/১৪৭।

[৩] আল-বায়িস লিআবী শামাহ- পৃ. ২৩-২৪; বিস্তারিত দ্র. আল আইয়াদ ওয়া আছারুহা আলাল মুসলিমিন- পৃ. ২৮৬-২৮৯।

[৪] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- দারুল ফিকর, ১৯৮৬, ১৩/১৩৭।

[৫] মীলাদুন্নাবী- আব্দুস সাত্তার দেহলভী, পৃ. ৩৫।

[৬] সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮।

“তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী।”[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

“আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।”[২]

সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করা বিদ‘আত। কেননা এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৫৯৪ বছর পর ৬০৪ হিজরিতে আবিষ্কৃত হয়।

➡ ঈদে মীলাদুন্নাবী সম্পর্কে কতিপয় বিদ্বানের অভিমত :

১. শাইখ ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول ﷺ ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا الرسول الله، ومتابعة لشرعه ممن بعدهم.

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিলাদ বা অন্য কোনো মিলাদ উদযাপন করা জায়েয নয়; কারণ এটি দ্বীনে সৃষ্ট নতুন বিদ‘আত। রাসূল (ﷺ) এটি করেননি, তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনও করেননি, অন্য কোনো সাহাবীও করেননি এবং উত্তম যুগের তাবেঈনরাও করেননি। তাঁরা ছিলেন সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণে পরবর্তীদের চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।”[৩]

২. আল্লামা ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس معروفاً عن السلف الصالح، وما فعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله الصحابة، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا أئمة المسلمين من بعدهم.

“নিশ্চয়ই নবী (ﷺ)-এর জন্মদিন উদযাপন সালাফে সালিহীনদের মধ্যে পরিচিত ছিল না, আর না খুলাফায়ে রাশেদীন তা করেছিলেন, না সাহাবাগণ তা করেছিলেন, না তাদেরকে সুন্দরভাবে অনুসরণকারী তাবেঈন তা করেছিলেন, আর না তাদের পরবর্তী মুসলিম ইমামগণ তা করেছিলেন।”[৪]

৩. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع المحدثة التي لم يفعلها أحد من السلف الصالح.

“নবী (ﷺ)-এর জন্মদিন উদযাপন করা একটি বিদ‘আত, যা সালাফে সালেহীনদের কেউই করেননি।”[৫]

৪. শাইখ সালেহ আল ফাওযান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة في الدين.

“নবী করীম (আলাইহিস সালাম)-এর জন্মদিন উদযাপন করা দ্বীনের মধ্যে বিদ‘আত।”[৬]

➡ ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ড :

১. মিছিল ও শোভাযাত্রা : বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নাবীতে বহু মুসলিম দেশে বড় বড় শোভাযাত্রা ও মিছিল বের করা হয়। রাস্তাজুড়ে ব্যানার, ফেস্টুন, গাড়ি সাজানো হয়। ব্যান্ড দলের মাধ্যমে ইসলামী সংগীত বাজানো হয়। অনেক সময় এসব আয়োজন রাস্তার যানচলাচল বন্ধ করে দেয়, সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ, উচ্চ আওয়াজে গান-বাজনা, ঢাকঢোল ইত্যাদির মাধ্যমে অসংযত পরিবেশ তৈরি হয়– যা ইসলামী আদব ও শরীয়তের সুন্নাহসম্মত জীবনধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

রাস্তা জুড়ে শোভাযাত্রা, ব্যান্ড বাজানো, সাজ-সজ্জা করা হয়। ঈদে মীলাদুন্নাবীর নামে এসব ভণ্ডামি কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না।

২. মিলাদ মাহফিল ও কাসিদা পাঠ : মীলাদ মাহফিল উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নানা ধরনের পাপে লিপ্ত হয়। যেমন- নারী-পুরুষের মেলামেশা, গান-বাজনা ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। সর্বোপরি এসব মাহফিলে শিরকে আকবার তথা বড় ধরনের শিরকও সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা হলো– রাসূল (ﷺ) ও অন্যান্য আওলিয়া কেরামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের কাছে দু‘আ করা, সাহায্য চাওয়া, বিপদ থেকে মুক্তি কামনা করা এবং এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তারা গায়েবের খবর জানেন।

---

[১] *আবূ দাঊদ- ৪৬০৭; তিরমিযী- ২৬৭৬; মিশকাত- হা. ১৬৫।*
[২] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮।*
[৩] *মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায- ১/১৭৮।*
[৪] *মাজমু‘ ফাতাওয়া- ইবনু উসাইমীন, ২১/৬২।*
[৫] *মাজমু‘ আল ফাতাওয়া- ২৬/৩১৭।*
[৬] *আল ইজলাল আল ইল্মী ওয়াল ‘আমালী- পৃ. ১৫২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

অথচ এসব কাজ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। এ মাহফিলে নবী (ﷺ)-এর জন্ম, জীবনী নিয়ে বক্তৃতা, গান (কাসিদা), কবিতা, নাটিকা পরিবেশন করা হয়।

৩. তবারুক বা বিশেষ খাবার বিতরণ : মহানবী (ﷺ)-এর জন্মদিন উপলক্ষে বর্তমান সময়ে অনেক জায়গায় নবী (ﷺ)-এর নামে বিভিন্ন ধরনের মজাদার খাবার তৈরি করে তা বিতরণ করা হয়। সাধারণত এটি তবারুক বা বরকত হিসেবে নবীর নামে করা হয়। মানুষ মনে করে, নবীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে এই খাবার বিতরণ একটি সুনিশ্চিত সৎ কাজ। কিন্তু ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, এটি একটি বিদ'আত (নতুন উদ্ভাবন), অর্থাৎ- নবী (ﷺ) বা সাহাবাগণের যুগে চালু বা সুপ্রচলিত ছিল না।

৪. গান-বাজনা ও আলোকসজ্জা : বিভিন্ন মসজিদ, রাস্তা, গলি এবং বাড়িঘরকে বর্ণিলভাবে সাজানো হয়, বাতি ও লাইটিং করে আনন্দ উদযাপন করা হয়। অথচ ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের অপসাংস্কৃতিক আয়োজন বা বাহ্যিক চাকচিক্য কখনো উৎসাহিত করা হয়নি। এমনকি কিছু এলাকায় ডেক, গান-বাজনা, আতশবাজি, নাচ, আলোকসজ্জা দেখা যায়।

৫. নবী (ﷺ)-এর "আত্মা" আগমন বিশ্বাস করা : অনেকের ধারণা, রাসূল (ﷺ) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। আবার কেউ মনে করে, ঐ রাতে নবী (ﷺ)-এর রূহ্ আগমন করেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাই তারা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে দাঁড়িয়ে যায়। এটা বিরাট মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাসূল (ﷺ) কিয়ামত দিবসের পূর্বে আপন কবর থেকে বের হবেন না বা কারো সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করবেন না এবং কোনো সমাবেশেও উপস্থিত হবেন না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য নবীদের মতোই স্বীয় কবরে অবস্থান করবেন। অথচ রাসূল (ﷺ) বলেন,

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"কিয়ামতের দিন আমি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমার কবরই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে। আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সবার আগে গৃহীত হবে।"[১]

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে ১২ রবিউল আউয়ালকে তৃতীয় ঈদ হিসেবে পালন করা হয়। তবে ইসলামী শরীয়তে ঈদ মাত্র দু'টি– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। নবী (ﷺ)-এর জন্মদিন হিসেবে এই দিনকে পালন করার জন্য 'জেশন বেলাদাত' নামে অনুষ্ঠান, মীলাদ, মাহফিল ও জলুসের আয়োজন করা হয়। চারিদিক আলোকসজ্জা, গেট সাজানো, ঝাণ্ডা ও পতাকা উড়ানোসহ বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতী কাজ সংঘটিত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।

➡ ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে মুসলিমের করণীয় : ঈদে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে বিশেষ কোনো 'আমলের বর্ণনা শরীয়তে নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে কোনো 'আমল করেননি, তাঁর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম কিছু করেননি, খুলাফায়ে রাশেদীনের কেউ কিছু করেননি, এমনকি তাঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ কিছু করেননি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত কোনো 'ইবাদত করা, অনুষ্ঠান করা জায়েয নয়; বরং প্রতিদিন যে সকল 'ইবাদত পালন করা হয়, ঐ দিনও তাই পালন করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহব্বত করা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁর পরিপূর্ণ ইত্তেবা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾

"আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[২]

➡ উপসংহার : ঈদে মীলাদুন্নাবী একটি ইতিহাসনির্ভর ও সমসাময়িকভাবে আলোচিত বিষয় হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনো বৈধতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায়, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এমন কোনো 'আমল বা আয়োজনের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইসলামে 'ইবাদত ও উৎসব নির্ধারিত হয় কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা; তাই নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোনো 'ইবাদতের পদ্ধতি বা দিন নির্ধারণ করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকাই প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মদিবস পালন নয়; বরং পরিপূর্ণভাবে তাঁকে অনুসরণই কাম্য। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও সে অনুযায়ী 'আমল করার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৭৮।*

[২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কিয়ামতের পূর্বাভাস : অদ্ভুত পশু দাব্বাতুল আরয

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী*

আখেরী যামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যমীন থেকে দাব্বাতুল আরয্ নামক এক অদ্ভুত জন্তু বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। এটি হবে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম সর্বশেষ ভয়াবহ আলামত। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এটি বের হবে। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম আকাশে সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পরই যমীন থেকে এই অদ্ভুত জানোয়ারটি বের হবে। তাওবার দরজা যে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে– এ কথাটিকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার জন্য সে মু'মিনদেরকে কাফির থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মু'মিনের কপালে লিখে দেবে 'মু'মিন' এবং কাফিরের কপালে লিখে দেবে 'কাফির'।

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদ থেকে যা জানা যায়– আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾

"যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী নির্গত করবো। সে মানুষের সাথে কথা বলবে, এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করতো না।"[১]

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আখেরী যামানায় মানুষ যখন নানা পাপাচারে লিপ্ত হবে, মহান আল্লাহর আদেশ পালন বর্জন করবে এবং দীনকে পরিবর্তন করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে এই জন্তুটি বের করবেন।"[২]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "জন্তুটি মানুষের মতোই কথা বলবে।"[৩]

*ফাতওয়া গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

[১] সূরা আন্ নাম্‌ল : ৮২।

[২] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩/৩৫১।

[৩] পূর্বোক্ত উৎস।

প্রাণীটির কাজ কী হবে এবং কী বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে– এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বলেন, আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ- ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ এই বাক্যটি সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শোনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক মানুষই মহান আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে কিয়ামতের আলামত এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে। এমনকি আমার আগমনের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতো না। এখন সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি।

দাব্বাতুল আরয্ সম্পর্কে হাদীস থেকে যা অবগত হওয়া যায়

১) সহীহ মুসলিমে হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

اِطَّلَعَ النَّبِيُّ (ﷺ) عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ﷺ) وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

"একদা রাসূল (ﷺ) আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখবে ততদিন কিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া, (২) দাজ্জালের আগমন, (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাব্বাতুল আরয্ নামক অদ্ভূত এক জানোয়ারের উত্থান, (৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৫) 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের আগমন, (৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস, (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস, (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস, (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে।"[৪]

[৪] সহীহ মুসলিম- হা. ৩৯/২৯০১।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

২) নবী (ﷺ) বলেন :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلٰى خَرَاطِيْمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُوْنَ فِيْكُمْ حَتّٰى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيْرَ فَيَقُوْلُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُوْلُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِيْنَ.

“দাব্বাতুল আরয্ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দেবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে। প্রাণীটি সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দেবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবে, আমি এটি নাকে দাগওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি।”[১]

৩) নবী (ﷺ) আরো বলেন :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوْسٰى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتّٰى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هٰذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هٰذَا يَا كَافِرُ.

“দাব্বাতুল আরয্ বের হবে। তার সাথে থাকবে মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর লাঠি এবং সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর আংটি। কাফিরের নাকে সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর আংটি দিয়ে দাগ লাগাবে এবং মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেবে। লোকেরা খানার টেবিল ও দস্তরখানায় বসেও একে অপরকে বলবে, হে মু'মিন! হে কাফির!”[২]

প্রাণীটির ধরন কেমন হবে?

প্রাণীটি হবে মানব জাতির কাছে পরিচিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেটি মানুষের সাথে কথা বলবে। প্রাণীটি কোন শ্রেণীর হবে– এ নিয়ে ‘আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

১) ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি হবে সালেহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উটনীর বাছুর। যখন কাফিরেরা উটনীকে হত্যা করে ফেলল তখন বাছুরটি পাথরের মাঝে ঢুকে পড়েছিল। এটি আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিক্রমে কিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটিই বিশুদ্ধ মত।

তাঁর এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি যে হাদীস দিয়ে দলিল গ্রহণ করেছেন তার সনদে এমন একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

২) কেউ কেউ বলেছেন, এটি হবে দাজ্জালের হাদীসে বর্ণিত জাস্সাসা (গোয়েন্দা)। এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দাজ্জালের হাদীসে যে প্রাণীটির কথা এসেছে তার নাম জাস্সাসা। আর কিয়ামতের পূর্বে যে প্রাণীটি বের হবে তার নাম দাব্বাতুল আরয্ যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) কেউ কেউ বলেছেন, এটি হলো সেই সাপ যা কা'বার দেয়ালে ছিল। কুরাইশরা যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করার ইচ্ছা পোষাণ করল তখন সাপটিই তাদের নির্মাণ কাজ শুরু করতে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি পাখি এসে সাপটিকে ছো মেরে নিয়ে গেলে নির্মাণ কাজের বাধা দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ কথার পক্ষেও কোনো দলিল নেই। এমনি আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে। এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ কোনো একটি মতের স্বপক্ষে সহীহ কোনো দলিল পাওয়া যায় না।

শাইখ আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, “কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলা আছে এটি হলো দাব্বাতুল আরয্। দাব্বা অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই; বরং আমরা বিশ্বাস করি আখেরী যামানায় একটি অদ্ভুত ধরনের জন্তু বের হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসে তাঁর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাতে বিশ্বাস করি।”

পৃথিবীর কোন্ জায়গা থেকে প্রাণীটি বের হবে?

১) এটি বের হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত মসজিদ থেকে। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “সাফা পাহাড় ফেটে প্রাণীটি বের হবে। তিনি বলেন, আমি যদি চাইতাম তাহলে যে স্থানটি থেকে বের হবে তাতে পা রেখে দেখাতে পারতাম।”[৩]

২) জন্তুটি তিনবার বের হবে। প্রথমে বের হবে কা‘বা হতে দূরবর্তী একটি গ্রাম থেকে। অতঃপর কিছুদিন লুকিয়ে থাকার পর আবার বের হবে। পরিশেষে কা'বা ঘর থেকে বের হবে। এ ব্যাপারে আরো কথা বর্ণিত আছে। সব মিলিয়ে আমরা বলবো, মক্কা থেকে দাব্বাতুল আরয্ বের হবে। অতঃপর সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।

প্রাণীটির কাজ কী হবে?

১) প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলবে। প্রাণীটি কী বিষয়ে মানুষের সাথে কথা বলবে– এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী বলেন, আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বাণীটিই হবে তার কথা।

[পরবর্তী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ; সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা. ৩২২।*

[২] *আহমাদ- হা. ৭৯২৪, আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন।*

[৩] *তাফসীরে কুরতুবী- ১৩/২৬৩, তাবারানী ফিল আওসাত- ২/১৭৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসের গুরুত্ব এবং সহীহ ও জাল হাদীসের প্রামাণিকতা

-কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা : হাদীস ইসলামী শরী'আতে আল-কুরআনের পর দ্বিতীয় মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃত। কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য যে বিধি-বিধান উপস্থাপন করেছে, হাদীস উক্ত বিধানাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছে। তাই উৎস দু'টি একটি অপরটির পরিপূরক। কাজেই আল-কুরআন হলো- জ্ঞান-বিজ্ঞানের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। আর হাদীস হলো- এ হৃৎপিণ্ডের সচল একটি ধমনি। যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সৃষ্ট মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে। এ সুযোগে অসাধু ব্যক্তিরা নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হাদীসের অনুমোদনের জন্য জাল হাদীস রচনায় প্রবৃত্ত হয়। এজন্য যুগে যুগে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই বাছাই এবং সহীহ হাদীস নিরুপক এমন এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে মুসলিমদের জন্য একচ্ছত্র কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও গৃহীত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে হাদীস সংকলিত হয়ে ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে এর বিশ্বস্ততা নিশ্চিত হয়।

ওহী ও হাদীস : আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ফেরেশ্তার মাধ্যমে যে বার্তা প্রেরিত হয়েছে তাকে ওহী বলে। ওহী দুই প্রকার। যথা- **১.** প্রকাশ্য ওহী, **২.** অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন প্রকাশ্য ওহী এবং হাদীস অপ্রকাশ্য ওহী। কুরআন ওহীয়ে মাতলু যা তিলাওয়াত করা হয় এবং সালাতে পঠিত হয়; কিন্তু হাদীস ওহীয়ে গায়র মাতলু যা তিলাওয়াত করা হয় না এবং সালাতে পঠিতও হয় না। হাদীস ও কুরআন একই ওহীর মূল উৎস থেকে উৎসারিত। একটি অপরটির পরিপূরক। যেমন- আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ○ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾

"তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন, তা একমাত্র ওহী, যা দ্বারা তিনি প্রত্যাদিষ্ট। মহাশক্তিধর একজন ফেরেশ্তা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।"[১]

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ○ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ○ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾

"যদি তিনি আমার নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার গ্রীবা। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।"[২]

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (ﷺ) যদি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে দ্বীনবিষয়ক কোনো কথা বলতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধ্বংস করতেন। সুতরাং তাঁর সমুদয় কর্মকাণ্ড ছিল ওহীভিত্তিক। এজন্যই মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

অর্থাৎ- "আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সে সঙ্গে এর অনুরূপ আরেকটি জিনিসও দেয়া হয়েছে।"[৩]

আলোচ্য বাণীতে وَمِثْلَهُ مَعَهُ-এর অর্থ হলো- হাদীস, কেননা মহানবী (ﷺ)-এর নিকট থেকে মানব জাতি দু'টি জিনিসই লাভ করেছে, তা হলো- কুরআন ও হাদীস।

হাদীসের গুরুত্ব ও প্রমাণিকতা : হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পর এর স্থান। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমি আপনার প্রতি এ উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষের জন্য অবতীর্ণ এ গ্রন্থ তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন। যেন তারা এ নিয়ে চিন্তা করে।"[৪]

মহানবী (ﷺ) তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাতের সুমহান দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন। তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন, করেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন তার নির্ভরযোগ্য রেকর্ডই হলো হাদীস। আল-কুরআনে কোনো বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু হাদীসে উক্ত বিষয়ের বিবরণ বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১] সূরা আন্-নাজম : ৩-৫।

[২] সূরা আল-হা-ক্কাহ্ : ৪৪-৪৭।

[৩] সুনান আবূ দাঊদ- রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রি., পৃ. ২৯; মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ৪৬০৪, সহীহ।

[৪] সূরা আন্-নাহ্ল : ৪৪।

﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ﴾

“যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে যুল্‌মের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্য রয়েছে শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।”[১]

এখানে ظلم দ্বারা শির্‌ক বুঝানো হয়েছে। হাদীস যে আল-কুরআনের ভাষ্যকার, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, হাদীসের সাহায্য ব্যতীত আল-কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা ও এর সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণ করা দুষ্কর। হাদীস ব্যতিরেকে আল-কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে মহানবী (ﷺ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ قَالَ فِيْ الْقُرْآنِ برائه فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِيْ النَّارِ».

“যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতে কুরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।”[২]

হাদীস ইসলামী শরীয়তের অকাট্য দলিল হওয়া সত্ত্বেও খারিজী ও রফিযী' সম্প্রদায় হাদীসের অকাট্যতা বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং তারা বাহ্যিকভাবে শুধু কুরআনকে দলিলরূপে গ্রহণ করে সুন্নাহকে ত্যাগ করায় নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, অপরকে করেছে বিপদগামী।[৩]

আল-কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা হাদীসের অকাট্যতা প্রমাণিত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। তোমরা তাঁর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না, অথচ তোমরা তা শ্রবণ করছ। তোমরা ঐ লোকদের মতো হয়ো না যারা বলেছিল, আমরা শ্রবণ করেছি অথচ তারা কার্যত শ্রবণ করেনি।”[৪]

মহান আল্লাহর আনুগত্য যেমন ফরয, তেমনি রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য ও অপরিহার্য। এই জন্য একই সাথে أطيعوا শব্দটি ব্যবহার করে আনুগত্যের মানগত স্থানকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ﴾

“হে নবী বলুন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তোমরা তা না করো তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসে না।”[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾

“যে রাসূলের আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে।”[৬]

এ আয়াতে الرَّسُوْلَ দ্বারা মহানবী (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি রাসূল হিসেবে যা কিছুর নির্দেশ দেন তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, “কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আমরা শুধু তা-ই গ্রহণ করব, যা কুরআনে পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোনো কিছুই গ্রহণ করব না, তাহলে সে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে কাফির।”[৭]

হাদীস বর্ণনায় সনদ সহীহ হওয়ার শর্তাবলী : মুহাদ্দিসগণ রিওয়ায়াত পদ্ধতির আওতায় হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে হাদীস বর্ণনাকারী বিষয়ে কিছু শর্তারোপ করেছেন। এই শর্তাবলীর মধ্য থেকে একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকলে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। যেমন-

১. ইসলাম : প্রথম শর্ত মুতাবিক বর্ণনাকারীকে অবশ্যই খাঁটি মুসলিম হতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ﷺ) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ অনুগত হয়ে বাস্তব জীবনে তার পূর্ণাংগ প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে কেবলমাত্র একজন খাঁটি মুসলিম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। কথা ও কাজে গরমিল, লোকভয়ে কিংবা সুবিধা লাভের আশায় বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় বেশভূষার আস্ফালন, কিন্তু তাঁর অন্তস্থরূপ সম্পূর্ণরূপে বহিস্থরূপের পরিপন্থী ও অসংগতিপূর্ণ, এরূপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি কখনই খাঁটি মুসলিম হতে পারে না। তাই একনিষ্ঠ মুসলিম হওয়ার জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলীর প্রয়োজন হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সেসব মহৎ গুণের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে হতে হবে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী। শির্‌ক বা অংশীবাদিত্বের ছোঁয়া থেকে তিনি হবেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[৮]

---

[১] *সূরা আল-আন'আম : ৮২।*
[২] *জামি'উত তিরমিযী- পৃ. ৬৬৩।*
[৩] *দিফাউন আনিস সুন্নাহ- ড. মুহাম্মদ আবূ শাহ্‌বাহ, মিসর : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রি., পৃ. ১৪।*
[৪] *সূরা আল-আনফাল : ২০-২১।*
[৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩২।*
[৬] *সূরা আন্-নিসা : ৮০।*
[৭] *আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম- ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।*
[৮] *উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালহুহ- ড. সুবহী সালিহ, বৈরূত : দারুল ইল্‌ম লিল মালাইঈন, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ১৩৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

২. জ্ঞানসম্পন্ন বা বুদ্ধিমান হওয়া : জ্ঞান মানুষের এমন সুপ্ত প্রতিভার নাম, যা দ্বারা মানুষ তার অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার অবলম্বন খুঁজে পায় এবং এরই মাধ্যমে সে ভালো-মন্দ, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপন করতে সক্ষম হয়। এ জন্য হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান হতে হবে। জ্ঞানহীন ব্যক্তি, পাগল অথবা ছোট শিশু হাদীস বর্ণনাকারী হতে পারে না, তাই তাদের হাদীস বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১]

৩. সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা : হাদীস বর্ণনাকারীকে সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে আদর্শবাদী হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর ন্যায়পরায়ণতাকে আরবী ভাষায় عدالة বলা হয়ে থাকে। সে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে আল্লাহভীরু ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলা হয়। এ মানবীয় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও মিথ্যামুক্ত জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। আর তাক্বওয়া বলতে শির্ক, বিদ'আত ও ফিসক প্রভৃতি কবীরা গুনাহ এবং পুনঃ পুনঃ সগীরাহ্ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে বুঝায়। হাদীস বর্ণনাকারী যদি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ না হন, তাহলে তাঁর বর্ণিত হাদীস সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে না। এ জন্য সিহাহ্ সিত্তাহ্র ইমামগণ হাদীস গ্রহণীয় হওয়ার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীকে অবশ্যই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার গুণে গুণান্বিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।[২]

৪. যথার্থ সংরক্ষক তথা যবিত হওয়া : যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখন সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যবত বা সংরক্ষণ শক্তি বলা হয়। আর এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে যবিত বলা হয়। হাদীসের ইমামগণ হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই যবিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। যবত দু'প্রকার। যথা- ضبط الصدر ও ضبط الكتاب। প্রথমটির অর্থ হলো– শায়খ বা হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দ হুবহু স্মরণ রাখা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ হলো– যে গ্রন্থে শায়খের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বর্ণনাকারীর সে গ্রন্থ বর্ণনা করার সময় হুবহু শব্দাবলী মনে রাখা।[৩]

হাদীস বর্ণনার জন্য বর্ণনাকারীর মধ্যে এ গুণের উপস্থিতি অতীব প্রয়োজন। এ গুণ যার মধ্যে নেই, তিনি হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন না।

৫. বর্ণনাকারী ফাসিক না হওয়া : সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়াকে ফিসক বলা হয়। কথা, কর্ম ও বিশ্বাস সবটার মধ্যে ফিসক পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মুহাদ্দিসগণ ফিসক দ্বারা فسق العمل ও বুঝিয়েছেন। হাদীস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই ফিসকের যাবতীয় অসৎ আচরণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।[৪]

৬. হাদীস বর্ণনাকারী মুদাল্লিস না হওয়া : মুদাল্লিস বলা হয় এমন বর্ণনাকারীকে, যিনি সনদে ত্রুটি গোপন রেখে হাদীস বর্ণনা করেন। এর উদাহরণ হলো– একবার সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়ায়নাহ্ হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, قال الزهري তখন একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি স্বয়ং হাদীসটি ইমাম যুহ্রী থেকে শ্রবণ করেছেন কি? আবারও ইবনু উয়ায়নাহ বললেন, قال الزهري। প্রশ্নকারী ইমাম যুহ্রী থেকে শ্রবণ করিনি; বরং 'আব্দুর রাজ্জাক থেকে শুনেছি, তিনি মামার থেকে, মামার যুহ্রী থেকে শ্রবণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইবনু 'উয়ায়নাহ্ মুদাল্লিস এবং ইমাম যুহ্রী থেকে বা عن বা قال শব্দ যোগে তাঁর রিওয়ায়াত করা মুদাল্লিস বর্ণনা হিসেবে পরিগণিত হবে।[৫]

৭. হাদীস বর্ণনাকারী বিদ'আতী না হওয়া : বিদ'আতের অর্থ হলো– সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অথবা নিজে ব্যাখ্যা করে দ্বীনের ব্যাপারে এমন কোনো নতুন বিশ্বাস করা, প্রথা উদ্ভাবন করা বা প্রচলন করা, ইসলামী শরীয়তে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো অনুমোদন নেই।[৬]

এই বিদ'আতপন্থী ব্যক্তির হাদীস প্রত্যাখ্যাত। হাদীসের ইমামগণ বিদ'আতপন্থী বর্ণনাকারী থেকে কোনো হাদীস গ্রহণ করেননি। কেননা মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

"كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ."

অর্থাৎ- "প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্তিকর, আর প্রত্যেক ভ্রান্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৭]

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের সনদ তথা বর্ণনাসূত্র যাচাই করা অতীব প্রয়োজন।

---

[১] *আল-কাওকাবুল মুনীর- পৃ. ৩৮০-৩৮২।*
[২] *শুরুতুল আয়িম্মাতিল খামসাহ- আল-হামিযী, পৃ. ৫৩-৫৪।*
[৩] *দিফাউন আনিস সুন্নাহ- ড. আবূ শাহ্বাহ্, মিসর : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ৩১।*
[৪] *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ- পৃ. ১৮৫।*
[৫] *প্রাগুক্ত।*
[৬] *মিরকাতুল মাফাতিহ- মোল্লা 'আলী আল-ক্বারী, ১ম খণ্ড, মিসর ও আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি., পৃ. ১১২।*
[৭] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪, মা. শা., ১/২২৪।*

সূচীপত্র

জাল হাদীস থেকে সহীহ হাদীস বাছাই করার জন্য মুহাদ্দিসগণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।”[১]

জাল হাদীসের গোড়া পত্তন : হাদীসের ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, হিজরি ৪০ সালে জাল হাদীস রচনার একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এ সালে হাদীস শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে বানোয়াট ও জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভ্যন্তরীণ হাতিয়ার হিসেবে হাদীসকে ব্যবহার করার প্রবণতা শুরু হয়।[২]

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ মুসলিম মিল্লাতে বিভক্তি সৃষ্টি করে। এতে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা বিরাজ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পক্ষে অবস্থান নেয়। আর 'উমাইয়াহ্ বংশীয় লোকেরা মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র পক্ষ অবলম্বন করে। এ সময় উদ্ভব হয় খারিজী সম্প্রদায়ের।[৩]

তারা প্রথমে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র একান্ত সমর্থক ছিল। পরবর্তীতে তারা খিলাফত প্রশ্নে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিরোধী হয়ে ওঠে। এরই জের হিসেবে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নির্মম শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তাঁর শাহাদাতের পর 'উমাইয়্যাহ্ খিলাফাতকালে আহলে বায়ত খিলাফাতের হক্বদার বলে দাবি জানায় এবং তারা 'উমাইয়্যাহ্ খিলাফাতের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলী শিশাঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ় মুসলিম ঐক্যকে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত করে।[৪]

[১] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ৬।*
[২] *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী- পৃ. ৯১।*
[৩] *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী 'উলূমিল হাদীস- ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতীব, বৈরুত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি., পৃ. ২৫০।*
[৪] *আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী- পৃ. ৯১-৯২; আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয ফী উলূমিল হাদীস- পৃ. ২৫০।*

এই প্রত্যেকটি দল-উপদল নিজ নিজ চিন্তাধারাকে কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা নিজ নিজ সব মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের সমর্থন পেতে সক্ষম না হয়ে মিথ্যা হাদীস বানানোর আশ্রয় নেয়। কুরআন মুসহাফে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে তারা এতে মিশ্রণ করতে সক্ষম হয়নি। হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলিত না থাকায় তারা কৃত্রিম হাদীস বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এভাবে মওযু' হাদীসের গোড়া পত্তন হয়।[৫]

জাল হাদীস কী?

যে কথাটি বা হাদীসটি মানুষ নিজে তৈরি করেছে, তারপর সেটা মহানবী (ﷺ)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই জাল হাদীস নামে পরিচিত। সত্যিকার অর্থে যা হাদীস নয়, তবে মানুষ হাদীস হিসেবে জানে অর্থাৎ- প্রচলিত হাদীস। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে বাক্য মহানবী (ﷺ)-এর কথা, কাজ নয় যা ক্রুটিপূর্ণ, যার নির্ভরযোগ্য সনদ নেই তাই জাল হাদীস। অর্থাৎ- সহীহ হাদীসের বিপরীত।

জাল হাদীসবিষয়ক রচনাবলী : মুহাদ্দিসগণের মহৎ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে গোড়াপত্তন হয় রিজাল শাস্ত্রের ও হাদীস সমালোচনা অভিজ্ঞানের। সাথে সাথে মাওদু হাদীস নিয়ে আলাদা সংকলন তৈরি করার প্রয়াস চলে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে এ বিষয়ে প্রায় তিনশ'র ঊর্ধ্বে প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে এ বিষয়ে অনেক নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এ শাস্ত্রের পূর্ণতা দান করবে। নিম্নে জাল হাদীস নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

১. তাযকিরাতুল মাওদু'আত (تذكرة الموضوعات) **:** এটি হাফিয আবুল ফদল মুহাম্মদ ইবনু তাহির আল মাকাদিমী (মৃত্যু : ৫০৭ হি.) রচনা করেন।[৬]

তিনি গ্রন্থটিতে অক্ষরের ক্রমধারা অনুযায়ী জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস বিষয়ে ইমামগণের সমালোচনা বিধৃত করেছেন। গ্রন্থটিতে ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্ব প্রথম মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[৭]

২. আল মাওদূ'আত আল-কুবরা (الموضوعات الكبرى) **:** এটি ইবনুল জাওযী (মৃত্যু : ৫৯৭ হি.) সংকলন করেন। এটি

[৫] *সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ- ড. আব্দুল মা'বূদ, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ১০৮।*
[৬] *আর রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ্- পৃ. ১২৪।*
[৭] *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয- পৃ. ২৭৪।*

জাল হাদীসবিষয়ক সর্ববৃহৎ গ্রন্থ যা চার খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থাকার এতে জাল হাদীস সংকলনের পর উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।[১]

৩. আল-বায়িছু ‘আলাল খাল্লাস মিন হাওয়াদিসিল কাসসাস (الباعث على الخلاص من حوادث القصاص) : এটি হাফিয যায়নুদ্দীন আল-‘ইরাকী (মৃত্যু : ৮০৬ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আস-সুয়ূতী সংক্ষিপ্ত করে নাম দেন تحذير الخواص من أكاذيب القصاص। ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত রূপ ১৩৫১ হিজরিতে মিসরে প্রকাশিত হয়।[২]

৪. আল-লায়ালী আল মাসনু‘আহ ফী আহাদীসিল মাওদূ‘আহ (اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) : এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু : ৯১১ হি.) সংকলন করেন।[৩]

এটি মাওদু হাদীসবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৫. তানযীহুশ্ শারী‘আহ্ আল-মারফূ‘আহ্ আনিল আখবারিশ শানী‘আতিল মাওদূ‘আহ (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) : এটি আবুল হাসান ‘আলী ইবনু মুহাম্মদ আল কিনানী (মৃত্যু : ৯৬৫ হি.) সংকলন করেন। এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইমাম সুয়ূতী যে সমস্ত মওদু হাদীস উল্লেখ করেননি, তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৭৮ হিজরিতে গ্রন্থটি দুই খণ্ডে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[৪]

৬. আল-মাসনূ‘ ফী মা‘রিফাতিল হাদীসিল মাওদূ‘ (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) : এটি মুহাদ্দিস ‘আলী আল-ক্বারী (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) সংকলন করেন। এ গ্রন্থে শুধুমাত্র মাওদু‘ হাদীসই উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শায়খ ‘আব্দুল ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্-এর সম্পাদনা করেন ও টীকা সংকলন করেন। গ্রন্থটি বৈরুত মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্ থেকে ১৯৭৮ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[৫]

৭. আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ‘আহ ফী আহাদীসিল মাওদূ‘আহ (الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة) : এটি কাযী আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ‘আলী আশ-শাওকানী (মৃত্যু : ১২৫৫ হি.) তাঁর পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণের সংকলন থেকে সাহায্য নিয়ে সংকলন করেন। এতে মাওদু‘ হাদীস উল্লেখের পাশাপাশি কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে এটি মিসর থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৬]

৮. আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্ ফী বায়ানি কাছীরিম মিনাল আহাদীসিল মুশতাহারাহ্ ‘আলাল আলসিনাহ্ (المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) : এটি মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দুর রহমান আস-শাখাবী (মৃত্যু : ৯০২ হি.) সংকলন করেন। গ্রন্থটি আরবী অক্ষরের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে। এটি মাওদু হাদীসবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।[৭]

৯. কাশফুল খাফা ও মুযীলুল ইলতিবাস ‘আম্মা ইসতিহারা মিনাল আহাদীস ‘আলা আলসিনাতিন নাস (كشف الخفاء ومزيل الإلتباس عما إشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) : এটি শায়খ ইসমা‘ঈল ইবন মুহাম্মদ আল-আযালুনী (মৃত্যু : ১১৬২ হি.) সংকলন করেন। আরবী বর্ণমালার ক্রমধারা অনুযায়ী গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এটি দু’খণ্ডে সমাপ্ত মাওদু হাদীসবিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংকলন। আলেপ্পোরার আত-তুরাস আল-ইসলামী প্রকাশনালয় থেকে আহমাদ কাল্লাশ এর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া বৈরুতের মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ্ থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৮]

১০. য‘ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة) : এটি আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) সংকলন করেন। আবূ শিফা মুহাম্মদ আকমাল হুসাইন কর্তৃক অনূদিত; ঢাকা : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনিস্টিটিউট, ২০০৪ সাল। তিনি সহীহ ও য‘ঈফ হাদীসের ওপর পৃথক গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন। যার অন্যতম হলো سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة যার প্রতি খণ্ডে ৫০০ য‘ঈফ ও মওযূ‘ হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইন্ শা-আল্লাহ এ গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ য‘ঈফ ও জাল হাদীসের অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হাদীসের অনুসারী হবে। পরিশেষে বলা যায়, মু’মিনের জীবন আবর্তিত হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

[১] *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্- পৃ. ১২৩।*
[২] *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয- পৃ. ২৭৪।*
[৩] *আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ্- পৃ. ১২৩।*
[৪] *আল-মুখতাসারুল ওয়াজীয- পৃ. ২৭৪।*
[৫] *প্রাগুক্ত।*
[৬] *প্রাগুক্ত।*
[৭] *প্রাগুক্ত।*
[৮] *প্রাগুক্ত।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসকে কেন্দ্র করে। হাদীসের প্রতি এ স্বভাবজাত ভালোবাসা ও নির্ভরতার সুযোগে অনেক জালিয়াত বা বানোয়াট কথা হাদীস নামে সমাজে চালু হয়েছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুহাদ্দিসগণ দ্বীনে এ সকল জাল ও বানোয়াট কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করে মুসলিমদের সচেতন করেছেন। আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে হাদীসের পঠন, পাঠন ও চর্চা থাকলেও সহীহ, য'ঈফ ও বানোয়াট হাদীসের বাছাইয়ের বিষয়ে বিশেষ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ধরে অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা হাদীস নামে আমাদের সমাজে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। এছাড়াও দু'ভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। প্রথমতঃ এ সকল বানোয়াট হাদীস আমাদেরকে সহীহ হাদীসের শিক্ষা, চর্চা ও 'আমল থেকে বিরত রাখছে। দ্বিতীয়তঃ এগুলোর ওপর 'আমল করার কারণে আমরা মহান আল্লাহর কাছে পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তি পাওয়ার পথ করে নিচ্ছি। সর্বোপরি এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর 'আমল থেকে পরিত্রাণের জন্য মহান আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশনাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার বিকল্প পথ আর নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

অর্থাৎ- "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো; নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[১]

আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا كَذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস বলবে তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[২]

অতএব, জাল হাদীস গ্রহণ করার ফলে ধর্মের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ঢুকে পড়ে। আর সহীহ হাদীস প্রত্যাখ্যান করার ফলে ধর্মের মূল বিষয়গুলো বাদ পড়ে যায়। মিথ্যা কথা বলা আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা একই কথা। উভয়টিই সমান নিন্দনীয় ও মারাত্মক। ☒

[১] *সূরা আল-হাশ্‌র : ৭।*
[২] *আল-মু'জামুল কাবীর তাবারানী- সুলাইমান ইবনু আহমাদ (৩৬০ হি.), ৮/১২২, মা. শা., হা. ৭৫৫৭।*

কিয়ামতের পূর্বাভাস : অদ্ভূত পশু দাব্বাতুল আরয

[১৫ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

অর্থাৎ- ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ﴾ এই বাক্যটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে শোনাবে। মর্ম এই যে, আজকের পূর্বে অনেক মানুষই মহান আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করেনি। বিশেষ করে কিয়ামতের আলামত ও তা আগমনের বিষয়ে। এমনকি আমার আগমনের বিষয়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতো না। এখন সে সময় এসে গেছে এবং আমিও বের হয়ে এসেছি।

২) সে মু'মিনদেরকে কাফির থেকে নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে আলাদা করে ফেলবে। মু'মিনের কপালে লিখে দেবে 'মু'মিন' এবং কাফিরের কপালে লিখে দেবে 'কাফির'। নবী (ﷺ) বলেন :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَىٰ خَرَاطِيْمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُوْنَ فِيْكُمْ حَتّٰى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيْرَ فَيَقُوْلُ مِمَّنِ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُوْلُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِيْنَ.

"দাব্বাতুল আরয্ বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দেবে। অতঃপর মানুষেরা পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে। প্রাণীটি সকল মানুষের নাকেই দাগ লাগিয়ে দেবে। এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবে, আমি এটি নাকে দাগওয়ালা একজন ব্যক্তির নিকট থেকে কিনেছি।"[৩]

নবী (ﷺ) আরো বলেন :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوْسٰى وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ فَتَجْلُوْ وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتّٰى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُوْنَ فَيَقُوْلُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُوْلُ هَذَا يَا كَافِرُ.

"দাব্বাতুল আরয্ বের হবে। তার সাথে থাকবে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর লাঠি এবং সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর আংটি। কাফিরের নাকে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর আংটি দিয়ে দাগ লাগিয়ে দেবে এবং মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর লাঠি দিয়ে মু'মিনের চেহারাকে উজ্জ্বল করে দেবে। এমনকি লোকেরা খানার টেবিলে (দস্তরখানায়) বসেও একে অপরকে বলবে, হে মু'মিন! হে কাফির!"[৪] ☒

[৩] *মুসনাদে আহমাদ; সিলসিলায়ে সহীহাহ্- হা. ৩২২।*
[৪] *আহমাদ- হা. ৭৯২৪, আহমাদ শাকের বলেন, সনদ সহীহ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ (ﷺ)

–মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন*

মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও তিনি মহামানব। সাধারণের মাঝে থেকেও তিনি অসাধারণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত। ফেরেশ্তাকুলের নিকট সম্মানিত। জগদ্বাসীর অনুকরণীয় আদর্শ। মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির দিশারি। বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। পরকালীন জীবনে শাফা'আতের কাণ্ডারী। জগতবাসীর মহান শিক্ষক। তাঁর জীবন ও কর্মের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য বহুমুখী শিক্ষা। তারমধ্যে অন্যতম হলো জীবনের প্রতিটি কাজে পরিমিতিবোধের চর্চা করা।

মানুষের সম্মান ও মর্যাদা যে বিষয়টির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার মাধ্যমে একটি অশান্ত পরিস্থিতি শান্ত হতে পারে। যে কারণে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের মাঝে ঘটে সম্পর্কের চরম অবনতি। বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়। একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। হাজারো মানুষের প্রাণ চলে যায়। তা হলো মানুষের কথা। কথা বলার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) সর্বোচ্চ সতর্ক হতে বলেছেন। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা মু'মিনের একটি বিশেষ গুণ। কারো কাছে কথা লাগানো খুবই গর্হিত কাজ। মিথ্যা বলা মহাপাপ। শুধু পাপ নয় এ সম্পর্কে নবী করীম (ﷺ) বলেন "মিথ্যা সকল পাপ কর্মের জননী।" রাসূল (ﷺ) আরো বলেছেন, যারা জান্নাতে যাবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জিহ্বা হিফাজতকারী। এ থেকে কথা বলার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধর গুরুত্ব খুব সহজেই বুঝা যায়।

সুন্দর ও সুস্থ জীবন সকলের কাম্য। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রতিটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত। সুস্থতার জন্য পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্ষুধা না লাগলে খাবার খেতেন না। চৌদ্দশ বছর আগে তিনি যে খাদ্যাভ্যাসের কথা বলেছেন তা আজও মেডিকেল সায়েন্স কর্তৃক স্বীকৃত। কোটি কোটি মানুষ কর্তৃক অনুসৃত। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমাদের ক্ষুধাকে তিন ভাগ করে এক ভাগ পানি দ্বারা, একভাগ খাবার দ্বারা পূর্ণ করতে এবং এক ভাগ খালি রাখতে। তিনি উদরপূর্তি করে খেতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন, যারা উদরপূর্তি করে খায় কিন্তু তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে সে প্রকৃত ঈমানদার নয়। পরিমিতভাবে খাদ্য গ্রহণের এমন সতর্কবার্তা আর কী হতে পারে?

একটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দমূলক সমাজজীবনের জন্য আপ্যায়ন করা এবং কারো দা'ওয়াত গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আপ্যায়ন করার ক্ষেত্রে ধনী-গরীবের পার্থক্য করেননি। অতিদরিদ্র সাহাবীর আতিথ্য গ্রহণে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। মেজবানের আদর আপ্যায়নের বিষয় যত সাধারণই হোক না কেন তবুও তিনি গুরুত্ব দিতেন। মেজবানের খাবারের ত্রুটি খোঁজ করেননি; বরং শুকরিয়া করেছেন এবং দু'আ করেছেন।

সুস্থতার জন্য আর একটি অপরিহার্য বিষয় হলো ঘুম। ওষুধ খেয়েও যাদের ঘুম হয় না তারাই বোঝেন ঘুম কত বড় নিয়ামত। আবার অতিরিক্ত ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই রাসূল (ﷺ) 'ইশার সালাতের পর ঘুমের কথা বলেছেন। অপরদিকে ফজর সালাতের পর ঘুমানোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

দুনিয়া একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়ার জীবনে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। অসুস্থতা, দরিদ্রতা, ঋণ-এর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মানুষকে বিচলিত ও অস্থির করে তোলে। নিজের সর্বোচ্চ শক্তি-সামর্থ্য দিয়েও যখন উত্তরণের পথ খুঁজে পায় না তখন মানুষ অন্যের দারস্থ হয়। একান্তভাবে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। এমন পরিস্থিতিতে সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার নাম দান বা সাদাক্বাহ্। দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি 'ইবাদত। দানে বালা-মুসিবত দূর হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রাগ প্রশমিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি বেশি দান করতে বলেছেন। এমনকি রমাযান মাসে ঝড়ের বেগে দান করতে বলেছেন। অসচ্ছল অবস্থায়ও দান করতে বলেছেন। দানের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও দান করার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ থাকা আবশ্যক। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে রেখ না আবার খুব বেশি খুলে রেখ না। দানের ব্যাপারে এমন দার্শনিকতা পৃথিবীর আর কোথাও মিলবে না।

দীর্ঘ দশ মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা খুবই কষ্টকর। তাছাড়া যে কষ্টের, যে বেদনার কোনো তুলনা হয় না তাহলো মায়ের প্রসব বেদনা। প্রসবের পর সন্তানের সোনামুখ দেখে গোলাপের মতো মিষ্টি করে হাসতে পারেন একমাত্র মা জননী। নিজে না খেয়ে, না পরে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিয়ে, সুন্দর কাপড়ের ব্যবস্থা করে সুখের সাগরে যিনি ভাসতে পারেন তিনি হলেন বাবা। মা হলেন সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে, দুশ্চিন্তা-দুর ভাবনায় একটু স্বস্তি

** সহকারী শিক্ষক, উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ও প্রশান্তির শেষ ঠিকানা। বাবা হলেন সন্তানের জীবনে প্রবল খরতাপে বটবৃক্ষের ছায়া। মা-বাবা দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। যাদের আছে তারা যতটুকু বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন তার চেয়েও শত কোটি গুণ বেশি অনুভব করেন যাদের মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন না ফেরার দেশে তারা।

দুনিয়ার সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এমনকি মা বাবার চেয়েও অধিক ভালোবাসার মানুষ প্রিয়নবী (ﷺ)। একজন প্রকৃত ঈমানদার দুনিয়ার যেকোনো কিছুর থেকে রাসূল (ﷺ)-কে বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু এ ধরাধামের হতভাগা কিছু মানুষ রাসূল (ﷺ)-এর ওপর অনেক নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন করেছে। ইসলামের প্রথম যুগে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক্বরা নবী করীম (ﷺ)-এর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। রাসূল (ﷺ)-এর ধৈর্যের কাছে তাদের আঘাত ও অপমানের তীর ব্যর্থ হয়েছে। তিনি পরম করুণাময়ের দরবারে নির্বোধদের হেদায়াতের জন্য দু'আ করেছেন। তায়েফবাসীর অত্যাচারে তাদের পাথরের আঘাতে রাসূল (ﷺ)-এর শরীর রক্তাক্ত হয়েছে ও জুতা ভিজে রক্ত জমাট বেঁধেছে। তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) এমন অবস্থায় তাঁর নিকট এসেছেন। চৈতন্য ফিরে এলে তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন তায়েফবাসীকে নিশ্চিহ্ন করার। নবীজির অন্তর ছিল প্রতিহিংসামুক্ত। তাঁর হৃদয় ছিল ক্ষমার এক অথৈ সাগর। তাইতো তিনি তাফবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, "এদের জ্ঞান দাও প্রভু এদের ক্ষমা করো।" ক্ষমার এমন অনুপম উদাহরণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বছরের বারো মাসের মধ্যে সম্মানিত মাস রমাযান। এই মাস উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। দুনিয়াবাসী ছাড়াও কবরবাসীর জন্য আরো বেশি আকাঙ্ক্ষিত। রমাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে। প্রতিটি নেক 'আমলের সওয়াব ৭০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ মাসেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার জন্য রহমতস্বরূপ লায়লাতুল কদর রেখেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযান মাসে দিনের বেলায় রোযা রাখে, রাতে তারাবির নামায আদায় করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সারা বছরের গুনাহ মাফ করে দেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য পাপমুক্ত হওয়ার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

গাফুরুর রাহিমের পক্ষ থেকে এ বিশ্ববাসীর জন্য ক্ষমার যে অপূর্ব বাণী রাসূল (ﷺ) শুনিয়েছেন তা আমাদের যেমন চমকিত করে তেমনি আশান্বিত করে। "কোনো মানুষের গুনাহ যদি সাগরের ফেনা রাশির সমপরিমাণ হয় মহান আল্লাহর ক্ষমা তার চেয়ে অনেক বেশি।" যে সত্তার হাতে আমাদের জীবন মরণ, তাঁর অমোঘ আশার বাণী, "তোমারা আমার রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয়ো না"। এমনকি মানুষের পাপ পূণ্যের হিসাব শেষে পাপী বান্দার জন্য যে ভয়ংকর জাহান্নামের কথা বলা আছে তাদেরও নিষ্কৃতির অসাধারণ আশার বাণী শুনিয়েছেন রাসূল (ﷺ), "যে ব্যক্তি লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু বলেছে সে জান্নাতে যাবে"। এভাবেই প্রিয়নবী মুহাম্মদ (ﷺ) উম্মতের জন্য আশার বাণী শুনিয়েছেন পরম মমতায়। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির তিনটি কার্যকরী 'আমল হলো পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন, রমাযানে নিজেকে পাপমুক্ত করা এবং দুনিয়ার যে কোনো জিনিস অপেক্ষা রাসূল (ﷺ)-কে অধিক ভালোবাসা।

রাসূল (ﷺ) একবার মসজিদের মিম্বারের ১ম ধাপে পা রেখে বলেন, আমীন, ২য় ধাপে রেখে বলেন, আমীন, সর্বশেষ ৩য় ধাপে পা রেখে বলেন, আমীন। সমবেত সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিতো কখনো এভাবে আমীন বলেন না। এর কারণ কী, দয়া করে আমাদের জানাবেন? রাসূল (ﷺ) বলেন, আমি যখন ১ম ধাপে পা রাখি জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে বলেন, আপনার নাম শোনার পরও যারা দরুদ পড়ে না তারা ধ্বংস হোক, আমি বললাম, আমীন। ২য় ধাপে পা রাখলে জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) বলেন, যারা মা-বাবা'র একজনকে পেল অথবা উভয়কে পেল অথচ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারল না তারা ধ্বংস হোক, আমি বললাম, আমীন। সর্বশেষ ৩য় ধাপে পা রাখলে জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম) আমাকে বলেন, যারা রমাযান মাস পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারল না তারা ধ্বংস হোক। তখন আমি বললাম, আমীন।

মহানবী (ﷺ) ছিলেন একইসাথে বিশ্ববাসীর মহাসতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। তিনি মানব জাতির মুক্তির জন্য প্রত্যেকটি নির্দেশনা যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই দিয়েছেন। কমও না বেশিও না। তাঁর মন উম্মতের জন্য ব্যাকুল ছিল। চরম শত্রুর প্রতিও কখনো অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর নিজের গুরুত্ব, পিতা-মাতার গুরুত্ব এবং মাহে রমাযানের গুরত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট এত বেশি যে, মানুষের জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট। একদিকে তিনি এমন সুসংবাদ দিয়েছেন অপরদিকে এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে ধ্বংসের কঠিন সতর্কবার্তা শুনে জিব্‌রা-ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে সহমত পোষণ করেছেন।

রাসূল (ﷺ)-এর কথা ও কাজে পরিমিতিবোধ সত্যি অনন্য ও অসাধারণ।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধের চর্চা করে রাসূল (ﷺ) শাফা'আত লাভের মাধ্যমে আমরা জান্নাতী হতে চাই। দুনিয়ার জীবনে শান্তি চাই। হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্বাসাসুল হাদীস

খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

দশজন লোকের একটি দলকে নবী (ﷺ) গোপনে সামরিক তথ্য জোগাড় করার জন্য পাঠান। ‘আসিম ইবনু সাবিত আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তিনি তাদের আমীর নিয়োজিত করেন। আদেশ অনুযায়ী তারা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা যখন উসফান ও মক্কার মাঝখানে হাদআহ্ নামক জায়গায় পৌঁছেন তখন হুযাইল সম্প্রদায়, যাদেরকে বাণী লিহ্য়ানও বলা হয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে জানতে পারেন। তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রায় একশত তীরন্দাজ নিয়ে বের হয় এবং তাদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন তাদের অনুসরণ বুঝতে পারেন তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদেরকে কাফিররা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বলতে থাকে : নেমে এসো এবং আমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের সাথে আমরা এই মর্মে চুক্তি করছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না।

আসিম ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে (আমার) সাথীগণ! আমি কাফিরদের নিকট আত্মসমর্পণ করবো না। হে আল্লাহ! তোমার নবী (ﷺ)-কে আমাদের সংবাদ জানিয়ে দাও।” (এ কথা শুনে) কাফিররা তার ওপর তীর নিক্ষেপ করল এবং আসিমকে শহীদ করল। এরপর কাফিরদের প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস করে তিনজন লোক তাদের নিকট নেমে যান। তাদের মধ্যে খুবাইব, যাইদ ইবনু দাসিনাহ ও তৃতীয় একজন ছিলেন। তাদের ওপর কাফিররা নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর তিনজনকে তাদের ধনুকের রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। এমতাবস্থায় তৃতীয় লোকটি বললেন, এটা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ! তোমাদের সাথে আমি যাবো না। আমার জন্য রয়ে গেছে ঐ শহীদদের আদর্শ (শহীদ হওয়া)। তাকে ধরে কাফেররা টানতে থাকে এবং তাকে নিয়ে যাবার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু তিনি যেতে সম্মত হন না। তখন তারা তাঁকে হত্যা করে।

অতঃপর খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও যাইদ ইবনু দাসিনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে কাফিররা চলে যায় এবং তাদেরকে মক্কায় বিক্রয় করে দেয়। এটা বদ্‌র যুদ্ধের পরের ঘটনা। হারিস ইবনু ‘আমির ইবনে নাওফাল ইবনুল ‘আবদে মানাফের বংশধররা খুবাইবকে ক্রয় করে। আর খুবাইবই বদ্‌রের দিন হারিসকে হত্যা করেছিলেন। কাজেই খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট বন্দী থাকেন। অবশেষে তাঁকে তারা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। এ সময় তিনি নিজের নাভীমূলের ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করার জন্য হারিসের এক মেয়ের নিকট হতে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। তাকে মেয়েটি ক্ষুর দেয়। তার একটি শিশু পুত্র তার অসতর্ক অবস্থায় খুবাইবের নিকট চলে যায়। মেয়েটি খুবাইবের নিকট এসে দেখে যে, তার ছেলেটি খুবাইবের হাঁটুর ওপর বসে আছে এবং খুবাইবের হাতে ক্ষুর রয়েছে। সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তার ভয় খুবাইব টের পান। তাকে তিনি বলেন, আমি একে হত্যা করবো ভেবে তুমি বুঝি ভয় পেয়ে গিয়েছো। কখনো আমি এ কাজ করবো না। হারিসের কন্যা বলল, আল্লাহর শপথ, খুবাইবের চেয়ে উত্তম কয়েদী আমি আর দেখিনি। আল্লাহর শপথ, একদিন তাকে আমি দেখেছি তিনি শিকলে বাঁধা অবস্থায় আঙ্গুরের ছড়া হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিলেন, অথচ মক্কায় সে সময় ফলের মৌসুম ছিল না। হারিসের মেয়ে বলল, নিঃসন্দেহে তা এমন একটি রিয্‌ক ছিল যা খুবাইবকে আল্লাহ তা‘আলা দান করেছেন। তারপর কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল হারামের বাইরের এলাকায় নিয়ে যায়, তখন খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে বলেন, আমাকে সময় দাও, আমি দুই রাক‘আত নামায পড়বো। তারা তাঁকে সময় দিলে তিনি দুই রাক‘আত নামায পড়েন। তারপর বলেন,

وَاللهِ لَوْلَا اَنْ تَحْسَبُوْا اَنَّ مَا بِيْ جَزَعٌ لَزِدْتُ : اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا.

আল্লাহর শপথ, তোমরা যদি মনে না করতে যে, আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে আমি আরো অধিক নামায পড়তাম। হে আল্লাহ! এদের সংখ্যা গুণে রাখো, এদের সকলকে একের পর এক হত্যা করো এবং এদের একজনকেও ছেড়ে দিও না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

فَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ.

وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ.

“মুসলিম হিসেবেই আমি মরতে যাচ্ছি যখন আমার নেই কোনো পরওয়া, আল্লাহর পথে কিভাবে আমার প্রাণটি যাবে। (আমি জানি শুধু এতটুকু জানি) আমার মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহর পথে, আর কর্তিত জোড়গুলোর ওপর বারাকাত অবতীর্ণ করেন তিনি যদি চান।”

আর খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম মুসলিম ছিলেন, যিনি মহান আল্লাহর পথে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য নিহত হবার পূর্বে নামায পড়ার নিয়মের প্রচলন করেন।

ঘটনাটি থেকে শিক্ষা : ১. আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তার প্রিয় বান্দাদের জন্যই উত্তম রিয্‌কের ব্যবস্থা করেন। **২.** যারা আল্লাহর দ্বীনের পথে একনিষ্ঠভাবে থাকবে আল্লাহ তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন। **৩.** খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য নিহত হবার পূর্বে নামায পড়ার নিয়মের প্রচলন করেন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে ‘আমল বাতিল?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : শরীয়তের সকল বিষয় সুনির্দিষ্ট। সুতরাং শরঈ বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহ তা‘আলার ঘর মসজিদকে কেন্দ্র করেও আমরা অতিভক্তির আতিশয্যে বিভ্রান্ত হয়েছি। যেমন- আমরা মসজিদের মর্যাদার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি উক্তিকে হাদীস বলে গ্রহণ করেছি; যা জাল বলে প্রমাণিত। যেমন- আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি জাল হাদীসে মসজিদের মধ্যে ‘দুনিয়াবী কথা’ বলার কঠিন নিন্দা করা হয়েছে। এরূপ একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ :

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

“যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে ‘দুনিয়াবী কথা’ বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের ‘আমল বাতিল বা বরবাদ করে দেবেন।” আল্লামা সাগানী, তাহির পাটনী, মোল্লা ‘আলী ক্বারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস কথিত হাদীসটিকে একবাক্যে জাল বলেছেন। মোল্লা ক্বারী বলেন, “এ কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল, তেমনি এর অর্থও বাতিল।”[৮৪]

অনুরূপ আরেকটি জাল ও বানোয়াট কথা :

اَلْحَدِيْثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ.

“মসজিদে কথাবার্তা নেক ‘আমল খায়, যেরূপ পশু ঘাস-খড় খায়।” একই অর্থে আরেকটি জাল ও ভিত্তিহীন কথা হলো–

اَلْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

“মসজিদে কথাবার্তা নেক ‘আমল খেয়ে নেয়, যেরূপ আগুন কাঠ খায়।”

কোনো কোনো প্রসিদ্ধ ‘আলেম জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে এ বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইরাকী, ফাইরোযাবাদী, তাহির পাটনী, মোল্লা ‘আলী ক্বারী ও অন্য সকল মুহাদ্দিস একমত যে, এ বাক্যটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি কথা, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা হয়েছে।[৮৫]

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা আদবের খেলাফ। কেননা মসজিদ সালাত, যিক্‌র ও কুরআন তিলাওয়াতের স্থান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “এগুলো শুধু মহান আল্লাহর যিক্‌র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য।”[৮৬]

তাছাড়া মসজিদে উঁচু আওয়াজে কথা বললে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষ করে জামা‘আত শুরুর আগে যেন মসজিদ বাজারে পরিণত না হয়, তা থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন : আর (মসজিদকে) বাজারে পরিণত করা থেকে সাবধান।[৮৭] জনৈক ব্যক্তি জোরে কথা বললে, রাসূল (ﷺ) রেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাকে এসে ধমক দেন।[৮৮]

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এজন্য দুই ব্যক্তিকে শাসিয়ে বলেন : তোমরা যদি এই মদীনা শহরের বাসিন্দা হতে, তবে মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আমি দু’জনকেই কঠোর শাস্তি দিতাম।[৮৯] এতদ্ব্যতীত মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং হারানো বা পলাতক কিছু খোঁজ করতে বা চিৎকার করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।[৯০]

তবে সাধারণ জাগতিক কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি; বরং সাহাবীগণ মসজিদের মধ্যেই কবিতা পাঠ করতেন, জাহিলী যুগের গল্প-কাহিনী আলোচনা করতেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : “রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি ওঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবীগণ কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি (ﷺ) শুধু মুচকি হাসতেন।”[৯১]

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ﷺ) যা নিষেধ করেছেন, কেবল তা-ই বর্জনীয়। ইসলামে অতিভক্তি প্রকাশ বা অতিরঞ্জিত সবই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম। ☒

---

[৮৪] *সাগানী, আল-মাউদূ‘আত- পৃ. ৩৯; তাহির পাটনী তাযকিরাতুল মাউদূ‘আত- পৃ. ৩৬; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার পৃ. ২২৭; আল-মাসনূ- পৃ. ১৪৭; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/৪৪।*

[৮৫] *তাহির পাটনী, তাযকিরাতুল মাউদূ‘আত- পৃ. ৩৬; মোল্লা ‘আলী ক্বারী, আল-আসরার- পৃ. ১১৩; আল-মাসনূ- পৃ. ৬৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/৪৪।*

[৮৬] *সহীহ মুসলিম- ১/২৩৬, মা. শা., হা. ১০০/২৮৫।*

[৮৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০০২, মা. শা., হা. ১২৩/৪৩২।*

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭১।*

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৭০।*

[৯০] *সহীহুল বুখারী- ১/১৭৯; সহীহ মুসলিম- ১/৩৯৭; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- ২/২৭৪; আস-সুনানুল কুবরা- ২/৪৪৭।*

[৯১] *মুসলিম- হা. ৬৭০, আস-সুনানুল কুবরা- ১/৪০৪, ৬/৫১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ প্রতিবেদন

পুশইন সংকটে বাংলাদেশ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

বিশ্বব্যাপী পুশইন সংকটে মানুষ আজ বিব্রত। অকারণে মানুষের পৈতৃক ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে পার্শ্ববর্তী দেশে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার কোনো আইনী স্বীকৃতি নেই এবং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়। অধুনা ইংরেজি ভাষায় 'পুশইন' শব্দটি একটি ঘৃণাবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। পুশইন শব্দটি মূলতঃ 'পুশব্যাক'-এর বিপরীত শব্দ। এটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করানো বা ফেরৎ পাঠানোর মর্মন্তুদ প্রক্রিয়া। সম্প্রতি ভারত ইউনিয়ন অন্যায়ভাবে বাংলাদেশে নিরীহ মানুষদের পুশইন করে চলেছে।

পুশইনের দোহাই হলো ভাষা! আর ভাষায় কী না ভিনদেশী বিবেচনার মানদণ্ড।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বর্তমান পৃথিবীতে অন্তত ৪০ কোটি বাংলাভাষীর বসবাস। আমার ধারণা এর অর্ধেকই পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্রভারতে। বাংলাভাষায় কথা বললেই বাঙালি কিংবা বাংলাদেশি ভেবে পুশইন করা হচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো পুশইনদের অনেকেই ভারতীয় নাগরিক। বাংলাভাষায় কথা বলাই যেন কাল হয়ে গেছে।

আদিত্যনাথ আর হেমন্ত শর্মার বেশরম বাঙালি খেদাও অভিযানে বিব্রত বাংলাভাষী ভারতীয়রা। একটি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্য আসামে মাতৃভাষী বাংলায় কথা বলেন এমন প্রায় তিন লাখ ভারতীয় নাগরিক দেশটি থেকে বহিষ্কারের মুখে রয়েছেন। কয়েকদশক ধরে ভারতে বসবাস করে জাতীয় পরিচয় পত্র এবং ভোটার তালিকায় নাম ওঠানো ২ লাখ ৭৪ হাজার ৯৭৯ জনের নাগরিকত্ব নিয়ে এরই মধ্যে করা হয়েছে প্রশ্ন।

আসাম জুড়ে বিদেশি খেদাও কর্মসূচির অধীনে 'বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করে এসব মানুষকে নাগরিকহীন বানিয়ে বাংলাদেশে 'পুশইন' করে দেয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত হয়ে পড়েছে। আসামে বাংলাভাষীদের এভাবে দেশটি থেকে বহিষ্কার ঠেকাতে গড়ে ওঠা সংগঠন 'সিটিজেন রাইটস প্রটেকশন কমিটি'র (সিআরপিসি) কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাধন পুরস্কারস্থ এসব তথ্য জানান। পুরস্কারস্থ বলেন, ভয়ঙ্কর হলো– ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর এদের সিলেট সীমান্তের মহিশাসন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইতোমধ্যে একাধিক ভারতীয়কে পুশইন করতে দ্বিধা করেননি। জিঘাংসা চরিতার্থ করার নজীর আর কী হতে পারে?

শুধু পশ্চিম বাঙলা কিংবা আসামেই নয়, বিজেপি সরকারের ঘৃণ্য প্ররোচনায় বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ বেড়ে চলেছে। অন্য রাজ্যে কাজে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের। এই অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতিতে। বাঙালি মানেই বিদেশি এমন ধারণা পোষণ করছে এসব রাজ্যের সরকারগুলো।

ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, দিল্লীর মতো রাজ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশি হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ব্যতিক্রম নয় গুর গ্রাম। দিল্লী-লাগোয়া এই গুরগ্রামে ইতোমধ্যেই ১০ জনকে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত বাংলাভাষী বাঙালি পরিযায়ী বস্তিগুলো। শ্রমক্লান্ত মানুষগুলো রাতে ফেরে একটু বিশ্রামের জন্য। কিন্তু বিশ্রাম কই? আতঙ্ক ও আশঙ্কায় নির্ঘুম কাটাতে হচ্ছে বেচারা শ্রমিকদের। রাতের অন্ধকারে দরজায় এসে জোরে জোরে লাথি মেরে দরজা খুলতে বাধ্য করা হয়। টেনে হিঁচড়ে বের করে অমানুষিক নির্যাতনের মুখে স্ত্রী-সন্তানদের আর্তনাদ ও আহাজারিকে উপেক্ষা করে প্রায় গুম করে ফেলা হয়। আধার কার্ড দেখিয়েও কোনো রেহাই মেলে না। বাংলাদেশি তক্‌মা দিয়ে

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইনস্টিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রতিনিয়ত তুলে নিয়ে যাচ্ছে। হতভাগা এই মানুষগুলোকে দেখভালের যেন কেউ নেই।

এমনই ঘটনার শিকার হয়েছেন মালদার এক বাসিন্দা, নাম আঞ্জারুল। পাঁচ বছর আগে পেটের দায়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেন তিনি। যান হরিয়ানায়। সেখানকার টিগরগাওতেই ঠিকানা গড়েন। পেশায় রঙ মিস্ত্রি তিনি। হঠাৎ একদিন তার ঘর থেকে তাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্জারুল সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বাংলাদেশি সন্দেহে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। কার্ড দেখিয়েও কাজ হয়নি।

এমনিতরো অকথ্য নির্যাতনের দুঃখগাঁথা মানুষকে হতচকিত করে তুলেছে। আঞ্জারুলের স্ত্রীকেও আঘাত হানতে পুলিশ পিছুপা হয়নি। পুলিশের নির্মম সজোর চড়ে আজও সে কানে কম শুনছে। এমনি অসংখ্য বাংলাভাষী মানুষকে কুখ্যাত ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। ভুপেন হাজারিকার মানবতাবাদী বার্তায় উচ্চকিত হয়েছে, 'মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু?' নাহ! সহানুভূতিতো নয়ই; বরং তার ভাষায় মানুষ মানুষকে পন্য করে মানুষ মানুষকে জীবিকা করে, রাজনীতি করছে।

এইভাবে নওগাঁ, মেহেরপুর, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও প্রভৃতি সীমান্ত এলাকা দিয়ে রাতের আঁধারে পুশইন করছে। নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে বি.এস.এফ বাধ্য করছে কাঁটা তারের বেড়ী অতিক্রম করতে।

পুশইন, পুশব্যাক আজ যেন রাজনৈতিক এজেন্ডায় রূপান্তরিত হয়েছে। সভ্যতার ক্রুর হাসি আজ মানবতাকে লজ্জিত করে তুলেছে। মানুষ মানুষের প্রতি এমনিতরো নিষ্ঠুর আচরণ অগ্রহণযোগ্য। বছরের পর বছর ভারতে বসবাস করেও তারা ভারতীয় হতে পারছে না। তাদের অনেক সন্তান ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের কাছে ভারতীয় হিসেবে পর্যাপ্ত নথিপত্র ছিল। কিন্তু পুশইন করার আগে তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সমস্ত নথিপত্র কেড়ে নেয়া হয়। এই ধরনের পুশইন প্রবণতা প্রতিবেশিসুলভ আচরণের পরিপন্থি। এই ধরনের একতরফা পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠিত প্রত্যাবাসন পদ্ধতি এবং দ্বিপাক্ষিক নিয়মের স্পষ্ট লংঘন।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ে উপমহাদেশে নতুন রাজনৈতিক টানাপড়েন শুরু হয়। ইংরেজরা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির আওতায় কাজ শুরু করে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রেখে মসনদকে নিরুপদ্রব করার চেষ্টা করে। ওয়াহদানিয়াতের ভাবধারার সাথে পৌত্তলিকতার সামান্যতম মিল নেই। তদুপরি মুসলমানরা তাঁদের ঔদার্য দিয়ে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ বসবাসের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ধর্মীয় আবরণে সৃষ্ট গেরুয়াধারীদের নিকৃষ্ট ও মানবতাবিরোধী নীতি প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে তুলে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের পরে তথাকথিত পুশইন, পুশ ব্যাকের প্রকাশ্য চর্চা শুরু হয়। মুসলমানরা যেমন দলে দলে তদানীন্তন পাকিস্তানে এসেছে, তেমনি ভারতে পাড়ি জমিয়েছে হিন্দুরা। সেই ধারার আংশিকচিত্র আজও চলমান রয়েছে। বিশেষ করে বিজেপি সরকারের শাসনামলে তা প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান। বাংলাদেশি বাছাইয়ের মানদণ্ড এবার বর্ণিত হয়েছে ভাষা। বাংলাভাষা। যে ভাষায় বিশ্বের চল্লিশ কোটি মানুষ কথা বলে, যে ভাষা সৃষ্টি করেছে নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। বিপ্লবী দোতনা স্ফুরিত হয়েছে নজরুলকে দিয়ে। আজ কিনা সে ভাষায় ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। বাংলাভাষাকে অপদস্থ করা হচ্ছে। বাংলাভাষী হলেই ধরো। বাংলাভাষায় কথা বললে নিস্তার নেই। ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি রেখে ছোট ছোট দলে ভাগ করে রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

মানবতার দুর্গম গলিপথে যেন হাঁটছে সভ্যতার অর্জন। ক্ষতবিক্ষত, জরাজীর্ণ চেহারা। চোখে কাপড় বেঁধে, অভুক্ত অবস্থায় নারী-পুরুষ, শিশুদের ঠেলে দিচ্ছে নিত্যদিন। একান্ত পড়শি দেশ হওয়ার কারণেও বিষয়টি দারুণভাবে বেমানান ও মর্মন্তুদ ঠেকছে।

পুশইনের ক্ষেত্রে ভারত অনেকটাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি, ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে হাজারো

ভারতীয়কে ট্রাম্প দেশছাড়া করেছে। আবারো ট্রাম্পের সহানুভূতি আদায়ের জন্য ইয়াহূদী-নরখাদক নেতানিয়াহুর কাছে ধর্ণা শুরু করেছে ভারত। সেই ভারত নির্মমভাবে ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর দোসর গেরুয়াধারী বিজেপি সরকার মুসলমানদের দেশছাড়া করতে উদ্যোগ নিয়েছে।

সুপ্রিয় পাঠক! দেশটাকে মুসলমানশূন্য করার পাঁয়তারা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন পর্বে তারা সে সকল এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে চলেছে। সম্প্রতি ওয়াকফ আইন সংশোধন, তারপর পেহেলগাম নাটক সবই কিন্তু মুসলমানদের টার্গেট করে। মাত্র ক'দিন আগে ভারতের একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিক তো বলেই ফেললেন, 'মুসলমানদের পিছনে দৌড়ে লাভ নেই'। চিরশত্রুর তক্মা দিয়ে বিতাড়নের নানা ফন্দি ফিকির করছে। মানসিক ও সামাজিক নির্যাতনে আজ ভারতীয় মুসলমানেরা দিশাহারা।

এমনি সংকটে মানবাধিকার সংগঠনগুলোও বিচলিত, বিব্রত। ভারতের একটি মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান বলেছেন, সীমান্ত বিরোধ, জনসংখ্যাগত উদ্বেগ এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনায় জর্জরিত এই অঞ্চলে ভারত তার প্রতিবেশী কুটনীতিতে একটি বিতর্কিত নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। যথাযথ প্রক্রিয়া, যাচাই বা কুটনৈতিক সমন্বয় ছাড়াই সন্দেহভাজন, অবৈধ অভিবাসীদের যাদের বেশিরভাগ বাংলাভাষী মুসলমান জোর করে বাংলাদেশে পুশইন অভিযান চালাচ্ছে। তারা বলেন, এই পদক্ষেপগুলো কেবল অমানবিক বা বেআইনী নয়, এগুলো আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশেষ করে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির নির্লজ্জ লঙ্ঘন। অথচ চুক্তিগুলোর সবকটিতেই ভারত স্বাক্ষরকারী দেশ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও এই পুশব্যাক বা পুশইন প্রক্রিয়াকে মানবতাবিরোধী হিসেবে অভিহিত করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আমরা আশা করবো ভারতের সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়গুলো সুরাহার উদ্যোগ নেবেন। সৎ প্রতিবেশি সুলভ সম্পর্ক পারস্পারিক কল্যাণকে তরান্বিত করবে। ☒

দেশ ভাগ-১৯৪৭ : প্রেক্ষিত ও প্রভাব

–মো. মজিবুর রহমান*

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট, ইউনাইটেড কিংডমের শাসনতান্ত্রিক, পরাধিনতা থেকে ভারতীয় জনতা স্বাধীনতা লাভ করে। জন্ম নেয় পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র।

কথাটি যত সহজে বলা হলো তত সহজে স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনাটি ঘটেনি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চালাতে হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

পেছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে– ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিবৃত্ত এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতশাসন আইনের নানান তফসিলী উপাখ্যাণ।

১৬০০ সন। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়, তারিখটা ছিল ৩১ ডিসেম্বর। এটি ছিল একটি নিছক বাণিজ্যিক সংস্থা। এই সংস্থা ব্রিটিশ মহারানির রাজকীয় সনদ অর্জন করে প্রবেশ করে ভারতের মাটিতে।

পরবর্তীকালে এ কোম্পানিই ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

১৭৫৭ সনে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর প্রান্তরে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব পরাজিত হলে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির পদানত হয়ে পড়ে।

১৮৫৮ সনে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার নিজেই ভারতের শাসন কার্য চালাতে থাকে। ব্রিটিশ কোম্পানি ও সরকারি শাসনের দুইশত বছরের ইতিহাস– ভারতের মান, সম্মান, ইজ্জত, আব্রু হরণ করেছিল। কেড়ে নিয়েছিল রাজনৈতিক অধিকার। কেড়ে নিয়েছিল ধনরত্ন, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য কোহিনুর মণি, কৃষিজ, বনজ, খনিজ সম্পদ। ভারতে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এই মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। কারণ, বঙ্গবিহার উড়িষ্যার রেভিনিউ চলে যায় কোম্পানির হাতে আর প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে দিল্লির নাবাবের হাতে। দুর্ভিক্ষের বছর কোম্পানি পূর্বের তুলনায় ৫,২২,০০০ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করলে কৃষকের

**সাবেক অধ্যক্ষ, শাহ সুলতান (*) কামিল মাদ্‌রাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ও বর্তমান অধ্যক্ষ, দেবীপুর রহমানিয়া মাদ্‌রাসা, তানোর, রাজশাহী।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ঘর ফসলশূন্য হয়ে পড়ে। অনাহারে প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়। বাংলার মোট মানুষের একতৃতীয়াংশই মৃত্যুবরণ করে। ব্রিটিশের অপশাসনে ভারতবাসীর নাভিশ্বাস ওঠতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি হয় ব্রিটিশবিরোধী নানা ধরনের তৎপরতা, ধীরে ধীরে ব্রিটিশবিরোধী মনভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এ মনোভাব পরবর্তীতে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে রূপান্তর লাভ করে।

শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম পর্ব ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ। এটিই ভারতের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় জোয়ানরা বিদ্রোহ করেছিল। কারণ,

১. ভারতের বহু রাজ্যের রাজন্যবর্গ ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি তাই তারা সিপাহীদের দ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

২. সামাজিক আচার আচরণে, হস্তক্ষেপ, ভারতীয়দের তুচ্ছজ্ঞান সিপাহীদের সহ্য হয়নি।

৩. ভারতীয় নানাবিধ ধর্মীয় আচার আচরণ মুছে ফেলার ইংরেজ প্রচেষ্টাকে মেনে নিতে পারেনি।

৪. ব্রিটিশরা ভারতের সম্পদ লুট করে নিঃস্ব করে ছেড়েছিল ভারতকে।

৫. গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, রাইফেলের কার্তুজের নালায় গরু ও শুকরের চর্বি পলিশ করতে হয়।

৬. ব্রিটেনবাসী ও ভারতবাসী সৈন্যদের বেতন বৈষম্য।

এতদবিধ কারণে ১৮৫৭ সনের ১০ মে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। গোটা ভারতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। ঝাঁসীর রানি লক্ষী বাঈ, তুলসীপুরের রানি ঈশ্বরী কুমারী দেবীসহ অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ব্রিটিশ সমর্থক পাঞ্জাবের শিখরাজ্যগুলো, হায়দ্রাবাদ, মহীসুর এবং আরো কিছু রাজ্য সমর্থন না দিলে বিদ্রোহটি সর্বভারতীয় বিদ্রোহে পরিণত হতে না পারায় অকার্যকর হয়ে যায়।

বিদ্রোহোত্তর ভারতে একের পর এক চলতে থাকে যুল্‌ম, নির্যাতন, অনাচার, অত্যাচার, ধরপাকড়, রাহাজানি আর গণহত্যা। এহেন প্রক্ষাপটে আরম্ভ হয় উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন।

ইতোমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের স্থিতি ও স্বস্তির উদ্দেশ্যে "ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" নামে একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি)। দাদাভাই নওরোজী এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো কিছু সংখ্যক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা অ্যালানঅক্টাভিয়ান হিউম ১৮৮৫ সনে ৭২ সদস্যবিশিষ্ট ডাব্লিউসি ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস পার্টি গঠন করেন। পাক-ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত যাঁরা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা হলেন−

১. ডাব্লিউসি ব্যানার্জী, **২.** সুরেন্দ্রনাথ, **৩.** দাদাভাই নওরোজী, **৪.** রাশবিহারী ঘোষ, **৫.** মহাত্মা গান্ধী, **৬.** জওয়াহারলাল নেহেরু, **৭.** সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ।

কংগ্রেস পার্টি প্রথমে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব পাশ করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ দমনপীড়ন আচরণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক স্বার্থে নীল চাষ করতে কৃষকদের বাধ্য করা হয়।

১৮৫৭ সন। পুরো ভারত ব্রিটেনের পদানত। ভারত জুড়ে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার দামামা বাজতে থাকে।

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই দামামার আওয়াজ ভারতের আকাশবাতাস প্রকম্পিত করতে থাকে। ইতোমধ্যেই বিশ্বরাজনীতিতে তোলপাড়। ১৯০৫ সনে বিশাল রাশিয়াকে ক্ষুদ্র জাপান যুদ্ধে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। রসাশিয়ান জার সরকারের বিরুদ্ধে প্রলয়ংকারী আন্দোলন এক রক্তক্ষয়ী আকার ধারণ করে।

ইউরোপীয় পরাশক্তিবর্গ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে তাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় মত্ত।

ভারত ব্রিটেনের উপনিবেশ। শাসনশোষণের উর্বর কর্মস্থল। এখানে ভালোই কাটছিল ব্রিটেনের দিনকাল। কিন্তু মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ১ম বিশ্বযুদ্ধে উপনীত হলো।

ভারতে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে। ব্রিটেন বিশ্বযুদ্ধের কোনো এক প্রতিপক্ষ। ভারতবাসী ব্রিটেনকে সঙ্গ না দিলে সমূহ বিপর্যয় ঘটতে পারে ব্রিটেনের।

আশ্বস্ত করল, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে।

যুদ্ধ তো শেষ হলো কিন্তু স্বায়ত্তশাসন রসাতলে। ফুঁসে ওঠল ভারতবাসী।

জোরদার আন্দোলন। স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা। চলে মিটিং, মিছিল। আনাচে কানাচে মাঠে-ময়দানে জনসভা। মিটিং-মিছিলের বিরুদ্ধে শুরু হলো ব্রিটিশের প্রতিরোধ কর্মসূচি। ব্রিটিশ সরকারের গণহত্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৯১৯ সনের ১৩ এপ্রিল ঘটে গেল এক লোমহর্ষক গণহত্যার ঘটনা।

পাঞ্জাব শহরের জালিয়ানওয়ালা বাগের শান্তিপূর্ণ জনসভায় ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল ডায়ারে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে বহু মানুষকে হত্যা করে। এই গণহত্যার প্রতিবাদে ১৯১৯ সনের ২২ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশের দেয়া তাঁর “নাইটহুড” উপাধী পরিত্যাগ করেন।...

স্বাধীনতা দান করো না, দিতেও চায় না। সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করে ছিনিয়ে আনতে হয় স্বাধীনতা। নেতাজী সুভাষ বসু আযাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ধাক্কা না দিলে দিল্লির চাঁদনীচক ময়দানের বক্তৃতায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে “কুইট ইন্ডিয়া” না বললে ভারত স্বাধীন হত না। ব্রিটেনকে ভারতছাড়া করল “ফরওয়ার্ডব্লক” আর সুবিধা ভোগ করল কংগ্রেস।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম মিলে একাকার হয়ে চলছিল, কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, বঙ্গভঙ্গসহ বেশ কিছু অসহিষ্ণু আচরণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করলে হিন্দু-মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্ব সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। ১৯০৬ সনে গঠিত হয় মুসলিমলীগ।

কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ যুগপৎ স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। মুসলিমগণ বুঝে ফেলেন যে, ভারতীয় হিন্দু-মহাসভা কংগ্রেসকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার সমুন্নত রাখতে দেবে না।

তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দিতে হবে। কংগ্রেস এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে একটি সমঝোতা বৈঠকের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আর ১৯১৬ সনে লাক্ষ্ণৌ বৈঠকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। উভয় দলই অত্র সম্মেলনে প্রাদেশিক আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বে ঐকমত্য পোষণ করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্মিলিতভাবে দূর্বার গতিতে এগিয় চলে। কংগ্রেস এই ঐক্যচুক্তি মেনে চলতে পারেনি। মুসলিমদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, হিন্দু-মুসলিম একই রাষ্ট্রে বসবাস করলে সংখ্যালঘু বিবেচনায় মুসলিম জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হবে। মুসলিমদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগের অধিবেশন। এই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মূল কথা ছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে একাধিক মুসলিমদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এ. কে ফজলুল হক অধিবেশনে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন।

ভারত উপমহাদেশে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। সৃষ্টি সুখের উল্লাস যেমন এক শান্তির আবহ তৈরি করে তেমনি আবার অপরিসীম বেদনায় বুকের ছাতি ভেঙে চুরমার করে ফেলে। স্বাধীনতার অগ্রপশ্চাৎ দিনগুলোতে বেধে যায় সাম্প্রদায়িক ভয়াবহ দাঙ্গা, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল সেই দাঙ্গায়। ১৯৪৬ সনে কোলকাতায় “ডাইরেক্ট অ্যাক্শন ডে” ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস। ফলে কোলকাতাসহ বাংলায় ও গোটা ভারতে ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, লক্ষ মানুষ নিহত হয়। প্রায় দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা; উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

দেশ ভাগের প্রভাবে কী ঘটেছিল? একটু আলোচনা করা যাক– ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

পুরো বাংলা ও পুরো পাঞ্জাব পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল। কিন্তু হিন্দু দাদারা মাদ্রাজ ও কাশ্মীর জবর দখল করে ফেলে। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় বহু মানুষ মারা যায়। দেড় কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে যায়। ভারত ও পাকিস্তান পরস্পর চির শত্রুতে পরিণত হয়।

কাশ্মীর বিবাদের জেরে ১৯৬৫ সনে যুদ্ধ বেধে যায়। বাঙ্গালী সৈন্যদের বীরত্বে ভারতের অনেক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হলে রণক্ষত্র ছেড়ে পরাজিত হয়ে ভারতের সেনারা পালিয়ে যায়।

তাসখন্দ চুক্তি করতে বাধ্য হয় : ওয়ারশো জোটের অন্তর্ভুক্ত হয় ভারত আর ন্যাটো জোটে চলে যায় পাকিস্তান।

পাকিস্তান মুসলিম জাতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। ইসলামের নামে দেশভাগ হলেও ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের দ্বারা পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা গভর্নরের অধীনেই চলতে থাকে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের মধ্যে আস্থার সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করলে ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের ফলে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ।

পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশ সৃষ্টি হত না। পাকিস্তান ও বাংলার মানুষকে হিন্দু দাদাদের চিরকাল অজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হত।

হে আল্লাহ! পৃথিবীর মানুষকে তুমি যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করো –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার; ইসলাম কী বলে?

-মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম*

(নোট : টিনএজ মানে উঠতি বয়সী। ১৩-১৯ বছর বয়সীদের টিনেজার বলা হয়)

চলমান বিশ্বে টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র মারাত্মক শোচনীয় ও করুণ, রুঢ় অবস্থা। ধর্মবোধ, নীতি নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোবল ও তথ্য প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ ছাড়াও মাদক দ্রব্যের সেবন আজকের শিশু-কিশোরদের ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের খাদে। ফলে জাতির আগামী দিনের প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ খ্যাত রূপকার আজ নিজেরাই সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন। টিন এজ সমস্যায় নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র মোটা দাগে স্পষ্ট। যাদের চরিত্র হওয়ার কথা ছিল মহোত্তম, উন্নত আদর্শ। সমাজ সংস্কারের রূপকার, জাতির পরবর্তী প্রজন্মের আইডল। অথচ সেই সকল টিনএজদের জায়গায় দখল করেছে মিথ্যা, সংঘাত, হিংসা বিদ্বেষ, মাদকদ্রব্য, অশ্লীলতা ছাড়াও খুন খারাবি। এমন এক সংকটময় নাজুক পরিস্থিতি টিনএজদের জীবনাকাশে আসার কারণ কী? এবং এর থেকে উত্তরণের পথ ও পন্থা কী হতে পারে? সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রচেষ্টা। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক্ব দান করুক -আমীন।

টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার :

১) পারিবারিক সুশিক্ষার অভাব : আজকের আধুনিকমনা অধিকাংশ পরিবারেই মারাত্মক সমস্যা হলো সন্তানকে সুশিক্ষা না দেয়া। বড় বড় নামী-দামী প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর জন্য সন্তানকে প্রাইভেট, কোচিং ছাড়াও বিভিন্ন মাধ্যমে মোটিভেট, টেক কেয়ার করছে। অথচ সন্তানকে মানসিকভাবে গড়ে তোলার সাথে সাথে উপকারী সন্তান, সমৃদ্ধশালী জাতির কাণ্ডারী হিসেবে গড়ার মানসে রূহের তথা আত্মিক শিক্ষার ঘাটতি বরাবরই আধুনিক অভিভাবকদের মাঝে লক্ষ্যণীয়। সুশিক্ষার বুনিয়াদি শক্তিই হলো পরিবার। প্রতিষ্ঠান মূলত বিল্ডিং, দালান কোঠার নাম। আর শিক্ষা জীবনের যাত্রা হয় পরিবার থেকেই। তাই পরিবার যদি সন্তানকে আদর্শ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার বুনিয়াদি ভিত্তি প্রস্তুত না করে তাহলে সেই সমাজ, রাষ্ট্র কখনোই উন্নত শিক্ষা, চিকিৎসা দিয়ে কোনো কিছুই করতে পারবে না। কেননা জাতি গঠনের শিক্ষা তথা সুশিক্ষার ভিত্তিই অবকাঠামো অনুপস্থিত ছিল। তাই সন্তানকে সুশিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষার চেতনা সৃষ্টি করতে হবে শিশু বয়সেই। নচেৎ যতই দিন যাবে সন্তান মানুষের বদলে বেশি বেয়াদব, অসভ্য হবে। তাই একজন সন্তানের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হলো তার পরিবার তথা শিক্ষিত মা। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন-

Give me a good mother. I will give you a good nation.

"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো।"

এজন্য সন্তানকে শিক্ষিত করতে চাইলে অবশ্যই একজন শিক্ষিত মা প্রয়োজন। খাদ্য পানীয়র চেয়েও একজন শিক্ষিত মা একটা আদর্শ পরিবারের জন্য অতীব জরুরি। কেননা ধর্মবোধ সৃষ্টি হয় পরিবার থেকেই। আর নৈতিকতাও সৃষ্টি হয় ধর্মবোধের চেতনা থেকে। তাই আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সুশিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা একটি আদর্শবাদী সমাজ নির্মাণে খুবই প্রয়োজন। তাই গুরুত্ব বোঝাতে Stanly Hall বলেন-

If you teach their the three "Rs" Reading, Writing and Arithmetic and don't teach the fourth "R" Religion they are sure to become fifth "R" Rascal.

"যদি তুমি তাদেরকে (টিনএজদের) তিনটি 'আর' তথা পড়া, লেখা ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা দাও এবং চতুর্থ 'আর' শিক্ষা না দাও তাহলে অবশ্যই তারা পাঁচ নাম্বার 'আর' এ বেয়াদব পাবে। পারিবারিক সুশিক্ষার অভাবে আজকের শিশু-কিশোরদের দ্বারা এমন কোনো অন্যায় নেই যা সংঘটিত হচ্ছে না। লাগামহীন জীবন চলার পথে ছেড়ে দিয়েছে আজকের আধুনিকমনা অধিকাংশ অভিভাবক। ফলে সমাজে শিক্ষিত সমাজ গঠনের জায়গায় এক অপদার্থ জাতি গঠন হওয়ার উপক্রম। তাই

শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক একাডেমী, সদর দিনাজপুর।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা যেমন মৌলিক অধিকার ঠিক তেমনি একজন মানুষের জীবনে সুশিক্ষাও মৌলিক অধিকার বললে ভুল হবে না। তাই প্রত্যেক পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কর্তব্য হলো সন্তানদের পারিবারিক সুশিক্ষার প্রশিক্ষণ দেয়া। তাহলে একটা ভালো, কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

২) অভিভাবকদের উদাসীনতা ও দায়িত্ব সচেতনতার অভাব : অভিভাবকদের উদাসীনতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার অভাবের দরুণ আজকের শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তাদের জীবনও মারাত্মক দূর্বিষহ ও চরম বিকারগ্রস্থ হচ্ছে। এই চলমান সমস্যার গোড়ায় পানি না ঢালা পর্যন্ত তথা অভিভাবকদের উদাসীনতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হওয়া পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা মোটেও সম্ভব হবে না। সন্তান কী করছে, কী পড়ছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে পড়ছে, কখন ঘুমাচ্ছে, কখন খাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে যদি অভিভাবক খোঁজ-খবর না রাখে তাহলে তো সন্তানকে স্পষ্ট ধ্বংসের মুখে নিজেই ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর অন্য কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়! এই ফিতনার যুগে যখন ঘরে বসেও ফিতনা থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না তখন সন্তানকে ঘরের বাইরের ফিতনা থেকে কিভাবে মুক্ত করবেন যখন আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন একলা পথে! এজন্য অভিভাবকদের যথেষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন। নইলে এ জাতির মাঝে আবারও ঐশী নামে নিকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হবে। যারা সমাজের বুকে নিকৃষ্ট জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে যুগের পর যুগ থাকবে জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। অভিভাবক যদি তাদের দায়িত্বের ভারত্বই না বুঝে এবং এর প্রয়োজনীয়তার সাথে গুরুত্বারোপ, জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি না হয় তাহলে তো একটি আমূল পরিবর্তনযোগ্য সমাজ কখনোই আশা পোষণ করা যাবে না। নীতি নৈতিকতার মূল্যবোধ সৃষ্টি করা অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শুধু সন্তান জন্ম দিয়েই বাবা-মা হওয়া যায়, কিন্তু উপযুক্ত অভিভাবক হওয়া যায় না। সন্তান জন্ম দেয় চতুস্পদ প্রাণীও। তাহলে এখানে মানুষ আর চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য হলো মূল্যবোধ, নীতি নৈতিকতা। যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিকভাবে পার্থক্য সূচিত করে। সন্তানকে যেমনভাবে শাসন করতে হবে ঠিক তেমনি আদর, ভালোবাসাও দিতে হবে। নচেৎ সন্তান নষ্ট হয়ে যাবে। অভিভাবকদের সন্তান গঠনে বড় ভূমিকা হলো– সন্তানকে তাঁর ঘুম থেকে শুরু করে টয়লেট পর্যন্ত সব বিষয়ে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া। তাহলে সেও যেমনভাবে উপকৃত ও সাজানো গোছানো পরিপাটি জীবনের অধিকারী হতে পারবে তেমনি সমাজে আদর্শ, মডেল অভিভাবক হিসেবেও সমাদৃত হওয়া যাবে। ফলে অনান্য অভিভাবকদের আইডল হওয়ায় মুসলিম পরিবারের সন্তান যোগ্য, সৎ ও আদর্শ সমাজের রূপকার হতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এজন্য অভিভাবকদের উদাসীনতার জায়গায় সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। যতক্ষণ অভিভাবকগণ দায়িত্ব সচেতন না হবে ততক্ষণ টিনএজদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করাও সম্ভব হবে না বলে মনে করা যায়।

৩) শিক্ষা সিলেবাসে সমস্যা : যে কোনো দেশের জাতির শিশুদের আগামীর দেশ গড়ার রূপকার, কাণ্ডারী করে গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদি বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। নচেৎ জাতির সফলতা, উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে সেই সাথে চারিত্রিক পদস্খলন অনিবার্য। এজন্য শিক্ষা সিলেবাস হতে হবে সমৃদ্ধশালী। নৈতিক শিক্ষা ছাড়াও এর অধ্যায়, অনুচ্ছেদের সাথে কবিতা, ছড়া, গল্পও হবে শিক্ষণীয়, আদর্শিক। ফলে শিশুমনেই উন্নত আদর্শ, নৈতিকতা জাগ্রত হবে। মনে মনে সেই রকম হওয়ার বীজ সেই শিশুমনের গহীনে বদ্ধমূল হবে। যদি এমনভাবে শিক্ষা সিলেবাস ঢেলে সাজানো যায় তবে আশু ফলাফল পাওয়া যাবে, নচেৎ শিক্ষা অর্জন হবে কিন্তু জাতীয় উন্নতি ও আদর্শ সমাজ গঠনের সাথে শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের গায়ে একটুও আঁচড় পড়বে না। বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো আজকের শিক্ষা সিলেবাস নিয়ে। নেই কোনো নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন পড়া; বরং তার জায়গা দখল করেছে বিভিন্ন ছবি, মূর্তি আর শিক্ষার নামে আজগুবি ছড়া, কবিতা। এমনকি ঈমান বিনষ্টকারী কুফ্রী মতবাদে ভরপুর পাঠ্য বইসমূহ। সবচেয়ে বেশি লজ্জা লাগে একজন মানুষের স্পর্শকাতর বিষয় তথা বয়স সন্ধিকাল, মাসিক পিরিয়ডসহ অপ্রীতিকর বিষয়গুলোও ভরা ক্লাসে লাজ-শরম পরোয়া না করে দিব্যি পড়ানো হচ্ছে আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাহলে আপনিই বিবেচনা করুন, কেন

অপরাধ সংঘটিত হবে না আজকের টিনএজদের হাতে। এজন্য শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন কাম্য। দেশ ও দশের কল্যাণ স্বার্থে শিক্ষা সিলেবাসে পরিবর্তন আবশ্যক।

৪) বিদেশি সংস্কৃতির আমদানি : বিদেশি সংস্কৃতির আমদানি যে কোনো দেশের জন্য উন্নতির অন্তরায়। দেশীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য একটা দেশের জন্য স্বনির্ভরতার প্রতীক ও পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্বল। দেশীয় সংস্কৃতি লালন, প্রতিপালন করা একজন দেশ-প্রেমিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদি সেটা শালীনতা বজায় রাখে, ধর্মের সীমানা অতিক্রম না করে। বাংলাদেশ সংস্কৃতিমনা একটি স্বাধীন দেশ। সংস্কৃতির উজ্জ্বল নেপথ্যে ধারক-বাহক মূলত এ দেশের মানুষই। বিশেষ করে এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীগণ। যারা ভবিষ্যৎতের রাহবার ও মূল ধারক, বাহক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো– এ দেশের সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দখল করেছে। ফলে সংস্কৃতি বললেই বিদেশি সংস্কৃতি বুঝে আজকের উদীয়মান টিনএজ। বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো– বিদেশি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করছে একশ্রেণীর জ্ঞান পাপী বুদ্ধিজীবী মহল। এমনকি বলতেও লজ্জা করে না "আবহমান সংস্কৃতি"। বিদেশি সংস্কৃতির একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ও অদূর ভবিষ্যতে আগুয়ান হওয়ার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। যতদিন বিদেশি সংস্কৃতিকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা না হবে ততদিন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের উন্নতি হবে না। এ জন্য দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য একান্তই জরুরি। বিদেশি সংস্কৃতির আমদানি মানেই দেশীয় সংস্কৃতিকে বিকলাঙ্গ, অবমূল্যায়ন করা। নিজের জাতিসত্তাকে লাঞ্ছিত করা। জাতীয় অস্তিত্বকে বিশ্ব মানচিত্রে সংকটে রাখা। তাই বিদেশি সংস্কৃতি নয়; বরং দেশীয় সংস্কৃতিই আজকের শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

৫) সহশিক্ষা : টিনএজদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য ছেলে-মেয়ে একসাথে পাঠদান নিষিদ্ধ করা খুবই জরুরি। নইলে সহশিক্ষার কুপ্রভাবে শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা মোটেও সম্ভব হবে না। কেননা উভয় উভয়ের জন্য বিপজ্জনক। নেগেটিভ ও পজিটিভ সম্পর্ক। সহ-শিক্ষা শিশু-কিশোরদের অবৈধ পথকে খুলে দেয় যার দরুণ শিশুর জীবন চলার পথেই নৈতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। এজন্য শিশু-কিশোরদের নৈতিকতাকে পূত ও পবিত্র রাখতে সকলের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন। যদি এমনভাবে চলতেই থাকে তাহলে ভবিষ্যৎ জাতির অন্ধকার। কেননা আদর্শিক বিপর্যয় কখনোই কোনো দেশ ও জাতিকে অগ্রসর হতে দেয়নি আর হতেও পারবে না। কারণ আদর্শ মানুষের জীবনকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত করে। জীবনকে করে সৎ, সুন্দর ও পরোপকারী। আজকের সাময়িক রিপোর্ট, পরিসংখ্যান অনুযায়ী এটা সবাই অবগত যে, সহ-শিক্ষার কুফলে শিশু-কিশোরদের কেমন পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের শারীরিক, মানসিক মন, মগজ। ফলে অপরাধপ্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে টিনএজদের মধ্যে। আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশের তো আরো করুণ অবস্থা। তা বলতেও লজ্জা লাগে। তাই জাতিকে বুঝাতে হবে শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ– সহ-শিক্ষা। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যখন একত্রিত হবে তখন এই পন্থা নিপাত করা সম্ভব হবে ইন্ শা-আল্লাহ। দৈনিক পত্রিকায় আমরা অহরহ দেখছি দুই মেয়ে এক ছেলেকে পাওয়ার জন্য ঝগড়া, বিবাদ। বন্ধু বান্ধবীকে, বান্ধবী বন্ধুকে হত্যা করছে নির্মম, নৃশংসভাবে। এমনকি সহ-শিক্ষার কুপ্রভাবে ছেলে-মেয়ে অবাধ মেলামেশায় বিবাহপূর্ব গর্ভে সন্তান ধারণ করার রেকর্ডও পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে হচ্ছে, শুনতে হচ্ছে।

৬) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা : বর্তমান সময়ে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা বেশি হওয়ায় যে কেউ নিষিদ্ধ পথে পা বাড়াতে পরোয়া করছে না। সস্তা দামে কেনার সুযোগ থাকায় মাদকদ্রব্যের খাদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। হাদীসে "মাদককে সকল পাপের মা" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেহেতু মাদকদ্রব্য মানুষের মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে, তাৎক্ষণিক হিতাহিত জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করে, তাই শরীয়তে মাদকদ্রব্যের সেবন, পরিবেশনসহ এ কাজে জড়িত হয়ে সাহায্য সহযোগিতার জন্য অভিশাপ, শাস্তির কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। মাদকদ্রব্য যেমনভাবে ব্যক্তির শরীরে প্রভাব ফেলে ঠিক তেমনি মানসিক, আর্থিকসহ বিভিন্ন স্তরে এর কুফল প্রভাবিত করে জীবনকে বরবাদ করে।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

৭) অসৎ সঙ্গের সাহচর্য : সর্বমহলে জ্ঞাত "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"। সৎ সঙ্গ জীবন চলার পথে দ্বীপ্ত মশাল জ্বালার এক অনন্য রূপকার। যে সঙ্গ সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পাশে থাকে সেটাই তো সৎ বন্ধুর পরিচয়। সৎ সঙ্গ একে অপরের জন্য দু'আ, কল্যাণ কামনা করে। পাপের পথে চলতে নিষেধ করে। পুণ্যের পথে চলতে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায়। মালিক ইবনু দিনার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : যে বন্ধুর কাছ থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না, তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করো।[৯২]

বিখ্যাত তাবেয়ী বক্‌র ইবনু মুহাম্মদ আল আবিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আমাকে দাঊদ আত-তায়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : হে বক্‌র! তুমি খারাপ মানুষ থেকে বেঁচে থাকো, যেভাবে তুমি হিংস্র প্রাণী থেকে দূরে থাকো।[৯৩]

'আব্দুল 'আযীয ইবনুল খাত্তাব বলেন : একদিন মালেক ইবনু দিনার (রাহিমাহুল্লাহ)'র কাছে একটি বিশাল ও ভয়ংকর কালো কুকুর বসে থাকতে দেখা গেল। এ দৃশ্য দেখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আবূ ইয়াহইয়া! আপনার পাশে যে, কুকুর বসে আছে? তিনি বললেন : এটি খারাপ বন্ধু থেকে উত্তম।[৯৪]

চিন্তা করুন! সালাফদের জীবন চলার গতি কেমন ছিল। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য তাঁদের মিশন কেমন ছিল। সৎ সঙ্গ গ্রহণের জন্য যেমন উদগ্রীব ছিল ঠিক তেমনি অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করে প্রয়োজনে একাকীত্ব বরণ করত, তবুও অসৎ সঙ্গ গ্রহণ করতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। দেখুন : বিখ্যাত তাবেয়ী ইব্‌রা-হীম ইবনু আদহাম (রাহিমাহুল্লাহ)'র অবস্থা। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো– আপনি মানুষের সাথে মেলামেশা করেন না কেন? তিনি বলেন : আমি যদি আমার চেয়ে উঁচু পর্যায়ের কারো সাথে মেলামেশা করি তাহলে সে আমার সাথে অহংকার করবে। আর যদি আমি আমার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কারো সাথে মেলামেশা করি তাহলে সে আমার যথাযথ হক্ব, সম্মান করতে পারবে না। আর যদি আমার পর্যায়ের কারো সাথে মেলামেশা করি তাহলে সে আমার ওপর হিংসা করবে।

[৯২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া- ২/৩৭২।*
[৯৩] *রওজাতুল উকালা- ৮২।*
[৯৪] *রওজাতুল উকালা- ৮২।*

এটাই বাস্তবতা। এজন্য খাদ্য, পানীয় যেমন জরুরি ঠিক তেমনি বন্ধু নির্বাচনে সৎ বন্ধু নির্বাচনে কোনো রকম গাফিলতি না করাও জরুরি। নচেৎ অসৎ বন্ধুর খপ্পরে পড়ে জীবন জাহান্নামের খাদে পড়বে। তাই সচেতন অভিভাবকদের উচিত হবে সন্তানকে সৎ বন্ধু নির্বাচনে সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্য, এর পরিণাম, ক্ষতিকর দিক আলোচনা করা। ফলে ছোট মগজে এই ট্যাবলেট দারুণ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

৮) আলেম ওলামাদের বক্তব্য, তালিম বিমুখতা : আমাদের আজকের সমাজের অধিকাংশ আধুনিক অভিভাবকগণ হরহামেশাই আলেম ওলামাদের সঙ্গে বাচ্চাদের সখ্যতা গড়াতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, লেখনী পড়ার প্রতি তাদের কোনো উৎসাহ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে না। ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সম্মানবোধ, ভক্তির জায়গায় বেয়াদবি, অশালীন আচরণ দখল করছে। এমন অনেক অভিভাবক আছে যাদের সন্তান দিন-রাত নেশার সাথে জড়িত ছিল, আলেমের সংস্পর্শে এসে বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক, জুয়া, নেশা বাদ দিয়েছে। 'ইবাদত বন্দেগী করে, বাবা মার সাথে ভদ্র মার্জিত ব্যবহার করে। কিন্তু আফসোস হয় ঐ অভিভাবকদের জন্য যারা সন্তানের এমন দৃশ্য দেখে ভয় পায় এই ভেবে, না জানি ছেলে আমার বিপথে, জঙ্গি হচ্ছে! এই ভেবে ছেলের ওপর চালায় নির্যাতন। একবার ভাবুন! যেই ছেলে দু'দিন আগে ছিল একটা অন্ধকার জগতে। আর সেই ছেলে আলেমদের সংস্পর্শে, বক্তব্য, লেখনী পড়ে এমন পরিবর্তন হচ্ছে অথচ অভিভাবকগণ দৃশ্যপটের পরিবর্তন করছে ভুল চিন্তা-ভাবনার খপ্পরে আটকা পড়ে। আলেমরাই একটি সৎ, নির্ভীক, কর্মঠ জাতি গঠনের রূপকার। আলেমরাই একটি আদর্শবাদী সমাজ নির্মাণের কারিগর। দৈহিক, মানসিক নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে আলেমরাই অবদান রেখেছে, রাখছে, রাখবে ইন্‌শা-আল্লাহ। তাই অভিভাবকদের উচিত হবে সন্তানদের বিজ্ঞ আলেমদের সাথে সখ্যতা তৈরি করে দেয়া। তাঁদের লেখনী, বক্তব্যর সাথে পরিচিত করা। ফলে এর মধ্য দিয়েই একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করা যেতে পারে।

৯) সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত করার জন্য উৎসাহিত না করা : সমাজ সংস্কারের জন্য সন্তানকে

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ছোট বয়স থেকেই উৎসাহ দিতে হবে। নিজেও নিয়োজিত থাকবে, সাথে সন্তানকেও রাখবে। তাহলে এই সমাজ সংস্কারের জন্য ছোট বয়সেই বড় হয়ে এমন বড় মন-মানসিকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে ইন্ শা-আল্লাহ। সন্তানকে সবসময় ভালো, পরোপকারী, কল্যাণকর কাজের প্রতি উৎসাহ জাগাতে হবে। সাথে করে নিয়ে এই সকল মহৎ কাজে শরিক করতে হবে। ফলে ছোট বয়সেই একটা শক্তিশালী অনুভূতি জাগ্রত হবে। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। যেমন- আপনি দান করেন। আপনার দানের টাকাটা নিজে ফকিরকে না দিয়ে আপনার সন্তানের দ্বারা দিন, দেখবেন এই দানটা আপনার সন্তানের জন্য কত বড় উপকারী হিসেবে কাজ করবে। এই ছোট্ট সামান্য কাজটি ছোট্ট শিশু মনে একটা দারুণ প্রভাব ফেলবে। বুঝতে শিখবে এভাবে ফকিরকে সাহায্য করতে হয়। এভাবে যেই কাজগুলোতে সমাজ সংস্কার হয়, দেশ, দশের উন্নতি সাধন হয়। একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণ হয় এ সকল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার সাথে নিজ সন্তানকে নিয়োজিত করলেও একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পাওয়া যাবে ইন্ শা-আল্লাহ।

১০) পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হওয়া : Pornography বলতে বুঝায়– যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অশ্লীল বাক্য, সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নাচের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ। তা হতে পারে সিনেমা, নাটক, ছবি, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে। পর্ণোগ্রাফি এতই সহজলভ্য হয়েছে যে শিশু-কিশোররা খুব সহজেই এতে আসক্ত হচ্ছে। অবাধ পর্ণোগ্রাফির বিচরণ জাতিকে নষ্ট, অসভ্য করে তুলছে। অশ্লীলতা, নোংরামি, নিলর্জতার এক বিরাট স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম আজকের টিন এজ সমাজ। যদি এই স্রোত অবরুদ্ধ করা এখন সম্ভব না হয় তাহলে টিনএজকে বাঁচানো অসম্ভব। শিশু-কিশোরদের অবাধ প্রযুক্তিতে বুঁদ হয়ে থাকায় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে ফলে ইউজারদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন নোটিফিকেশন আসায় একটা ক্লিকেই প্রবেশ করে অশ্লীলতার শহরে। ফলে সেখান থেকে ফিরে আসা বরাবরই টিনএজদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ড. ভূন বলেন– নিষ্পাপতার দিন শেষ। মানুষ এখন ইন্টারনেটে অনেক কিছু জানতে পারে। এটা হচ্ছে ঘরে হেরোইন রেখে বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়ার মতো।[৯৫]

পর্ণোগ্রাফির ছোবল বিষাক্ত। যা সকল পাপের পথকে খুলে দেয়। অপরাধপ্রবণ জাতি গঠনে পর্ণোগ্রাফির মারণ ছোবল থেকে জাতিকে মুক্ত করা খুবই জরুরি। পর্ণোগ্রাফি যৌনতার সুড়সুড়ি দেয়, ফলে শিশু বয়সেই অনৈতিক কাজে জড়িত হতে দ্বিধাবোধ করে না। এর নেশা মারাত্মক নেশা, মাদকদ্রব্যের চেয়েও ক্ষতিকর। অবৈধ সন্তানের কারখানা তৈরির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা লাভবান হওয়ার মানসে পর্ণোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে। আমেরিকার এক জরিপ বলছে– পর্ণোগ্রাফির আসক্তিতে প্রতি বছর আমেরিকায় স্কুলের ২৮ হাজার শিক্ষার্থী গর্ভবতী হচ্ছে। অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে– ১৪-১৬ বছর বয়সীর ২৫২ জনের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগেই অশ্লীল সিনেমা তথা পর্ণো দেখে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে।

যদি এমন করুণ চিত্র হয় তাহলে ভাবুন পর্ণোগ্রাফি কিভাবে জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করে দেয়। তাই এই পথকে রুখতে হলে দেশের যত অশ্লীল, খারাপ ওয়েবসাইট আছে তা বন্ধ করতে হবে এবং অভিভাবকদের শিশু কিশোরদের অবাধ মোবাইল ব্যবহার নিষেধ করতে হবে। যদি করে তাহলে তা চেক করবে। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে ভালো ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যত ভালো, মানসম্মত পরিবেশ আমাদের অভিভাবকগণ দিতে পারবে তাদের জীবন যাত্রার মানও তত বেশি উন্নত, সমৃদ্ধশালী হবে। তাদের সার্বিকভাবে সকল ধরনের নৈতিক, মানসিক অবক্ষয়মূলক কাজ, পরিবেশ, চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে রাখা এবং একটা স্বাস্থ্যকর, রুচিসম্পন্ন পরিবেশ উপহার দেয়া আমাদের সকল অভিভাবকদের দায়িত্ব কর্তব্য। নচেৎ একটু উদাসীনতাই একটি জাতির রূপকারতুল্য তরুণরা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই সকলের উচিত এই ফিতনার গোলক ধাঁধায় শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে একটি সৎ, নির্ভীক কর্মঠ জাতি গঠনের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

[৯৫] *দৈনিক ইত্তেফাক- ১৯ এপ্রিল-২০১৫, পৃ. ৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আত্মগঠন

কর্মের অপারগতা

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন★

মানুষের জীবনে কর্মশক্তি হলো অগ্রগতির চাবিকাঠি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতি কর্মঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তারা সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছায়; আর যে জাতি কর্মে অপারগ হয়, তারা বিলুপ্তির পথে যায়। কর্মের অপারগতা বলতে বোঝায়– অলসতা, অজুহাত, ভয়, দ্বিধা কিংবা ইচ্ছাশক্তির অভাবে কোনো কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতা। ইসলামের দৃষ্টিতে, এই অবস্থা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। মানব সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীর অগ্রগতি, সভ্যতার বিকাশ ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল অধ্যায়গুলোর পেছনে রয়েছে মানুষের কর্মশক্তি, অধ্যবসায় ও সৃজনশীল প্রচেষ্টা। যে জাতি কর্মঠ, সংগঠিত ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ থাকে, তারা সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সব ক্ষেত্রেই উন্নতির শিখরে পৌঁছায়; আর যে জাতি কর্মে অপারগ হয়ে পড়ে, তারা বিলুপ্তির অতলে তলিয়ে যায়। কর্মের অপারগতা বলতে বোঝায়– শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক ভয়, অজ্ঞতা, দায়িত্বহীনতা বা অলসতার কারণে প্রয়োজনীয় কাজে অংশগ্রহণে অক্ষমতা। এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়; বরং সমষ্টিগতভাবে এটি একটি সমাজ বা জাতির সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ‘ইবাদত নয়; বরং কর্মমুখর ও সক্রিয় জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে বলেছেন[৯৬] এবং অকর্মণ্যতা ও অজুহাত প্রদানের নিন্দা করেছেন।[৯৭] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু‘আয় স্পষ্টভাবে “অক্ষমতা ও অলসতা” থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।[৯৮] এর অর্থ, কর্মে অপারগতা শুধু দেহগত দুর্বলতা নয়; বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দোষও বটে।

ইসলামে কর্মের অপারগতা বা অক্ষমতা কোনো পাপ বা দোষ নয়; বরং আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। কোরআন ও হাদীসে অসুস্থতা, বয়সজনিত দুর্বলতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে কর্মে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ বিধান ও ছাড় রয়েছে। যেমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থ : “আল্লাহ কোনো প্রাণীকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব দেন না।”[৯৯]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। অর্থাৎ- কর্মে অক্ষমতা বা অসুস্থতার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট ‘ইবাদত বা দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে তাদের ওপর তা আরোপ করা হবে না। এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَشُقَّ عَلَى عِبَادِهِ.

অর্থ : “আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর কষ্ট আরোপ করতে চান না।”[১০০]

এই বক্তব্যে ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের ওপর কষ্ট আরোপ করতে চান না; বরং তাদের জন্য সহজীকরণ চান।

অথচ আমরা আমাদের জীবনে কর্মের অপারগতা নিজেরাই ডেকে আনছি। মূলত আমাদের কোনো কিছু করার জন্য কর্মসম্পাদনা করতেই হবে। উল্লেখযোগ্য কিছু মূলনীতি হলো–

ক) দৃঢ় মনোবল : মানুষের জীবনে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে দৃঢ় মনোবল কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়; বরং ঈমানের একটি

★ *অধ্যায়নরত, মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

[৯৬] *সূরা আল-জুমু‘আহ্ : ১০।*

[৯৭] *সূরা আন্-নিসা : ১৪২।*

[৯৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭২২।*

[৯৯] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৮৬।*

[১০০] *আল-মিনহাজ শরহে মুসলিম।*

অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরআন ও হাদীসে দৃঢ় মনোবলের গুরুত্ব ও তার উপায় স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন কারীমে আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"ধৈর্য ধারণ করো এবং তোমার ধৈর্য কেবল আল্লাহর মাধ্যমে।"[১০১]

ধৈর্য হলো দৃঢ় মনোবলের প্রধান দিক। কোরআন নির্দেশ দেয়, যে ব্যক্তি কঠিন পরিস্থিতিতেও মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে এবং ধৈর্য ধরে, সে সফল হয়। তাছাড়া মহান রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে এবং সত্য ও ধৈর্যের পরামর্শ দেয়।"[১০২]

খ) সার্বিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা : মানব জীবনের সাফল্য অর্জনের চেষ্টা ও প্রচেষ্টা অপরিহার্য। বিশেষ গুরুত্ব পায়। কোরআন ও হাদীসে বারবার আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যে, সাহায্য শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য যিনি নিষ্ঠার সাথে পরিশ্রম করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধারাবাহিক ও ধৈর্যশীল প্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের যা আছে তা পরিবর্তন করে।"[১০৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলেছেন– পরিবর্তন (ক্ষমতা, অবস্থা, উন্নতি) নিজের চেষ্টা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে আসে, শুধু আশা বা বসে থাকলে নয়। অপর একটি আয়াতে বলেন,

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾

"এবং মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে লাভ করবে।"[১০৪]

এই আয়াতে সরাসরি বলা হয়েছে– মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু যা সে চেষ্টা করেছে।

চেষ্টা ও প্রচেষ্টার কতিপয় প্রকার রয়েছে। যেমন-

★ **শারীরিক প্রচেষ্টা :** দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, অধ্যয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান।

★ **মানসিক প্রচেষ্টা :** জ্ঞান আহরণ, চিন্তাশীলতা, পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ।

★ **আত্মিক প্রচেষ্টা :** নৈতিকতা, চরিত্র, ধৈর্য্য ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা।

এই তিনটি প্রচেষ্টা মিলিত হলে একজন মুসলমান প্রকৃত অর্থে সাফল্য অর্জন করতে পারে।

গ) ধারাবাহিকতা ও ধৈর্য্য : ইসলামে প্রচেষ্টা কেবল শুরু করা নয়; বরং ধারাবাহিকভাবে তা চালিয়ে যাওয়াই বড় বিষয়। কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا﴾

"তোমরা ধৈর্য্য ধরো, নিশ্চয় ধৈর্যশীলরা বিজয়ী হবে।"[১০৫]

ধৈর্য (صبر) ও ধারাবাহিকতা (المداومة على العمل) সম্পর্কে নিম্নোক্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী হলো–

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رضي الله عنه) أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ : "وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ".

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো দান দেওয়া হয়নি।"[১০৬]

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : "أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ".

'আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ সেই কাজ যা নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।"[১০৭]

---

[১০১] *সূরা আন্-নাহ্ল : ১২৭।*
[১০২] *সূরা আল 'আসর : ৩।*
[১০৩] *সূরা আর্-রা'দ : ৩৯।*
[১০৪] *সূরা আন্-নাজম : ৩৯।*
[১০৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২০০।*
[১০৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪৬৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৫৩।*
[১০৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৬৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৮৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

এই দুই হাদীস একত্রে আমাদের শিখায় যে, ধৈর্য ছাড়া ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়। ছোট ছোট 'আমলও যদি ধারাবাহিক হয়, মহান আল্লাহর কাছে তা অধিক প্রিয়।

★ এ কয়েকটি জিনিস আমাদেরকে কর্মের অপারগতা থেকে রক্ষা করবে ইন্ শা-আল্লাহ। এখানে আমরা কিছু তুলে ধরবো যেমন- ইসলামী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, খোলাফায়ে রাশিদীন, 'উমাইয়াহ্ ও 'আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে– জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান, যুদ্ধনীতি ও অর্থনীতিতে সক্রিয়তা ছিল প্রবল; ফলে মুসলিম সভ্যতা বিকশিত হয়। পরে বিলাসিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দায়িত্বহীনতা মুসলিম জগতে কর্মে অপারগতা ডেকে আনে; যার ফলে আন্দালুস, বাগদাদ, দিল্লি সালতানাত– অনেক কিছু হারিয়ে যায়। বাংলার ইতিহাসে, স্বাধীন সুলতানি যুগে কৃষি, বাণিজ্য, জাহাজ নির্মাণে কর্মচাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু মুঘল পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক দুর্বলতা ও অলসতার কারণে উপনিবেশবাদীরা দখল নেয়। ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে, ভূগোল মানুষের কর্মশক্তিতে প্রভাব ফেলে। উর্বর ভূমি, নদী ও আবহাওয়া কৃষিনির্ভর সমাজে কর্মপ্রবণতা বাড়ায়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কঠিন জলবায়ু বা অতিরিক্ত সম্পদ-প্রাচুর্য মাঝে মাঝে মানুষকে অপারগ করে তোলে। যেমন- কিছু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষকে নির্ভরশীল করেছে; অন্যদিকে শুষ্ক মরুভূমি কঠোর পরিশ্রম শিখিয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রায়ই কর্মে অপারগতার জন্ম দেয়। শাসক শ্রেণির জনগণকে কর্মপ্রণোদনা থেকে বঞ্চিত করে। উপনিবেশিক শাসনে স্থানীয় জনগণকে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মে অপারগ করে রাখা হয়েছে, যাতে তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই না করে। আধুনিক যুগে দুর্নীতি, বেকারত্ব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মানুষকে হতাশ করে, যা অপারগতার দিকে ঠেলে দেয়।

এই সম্পর্কে **দু'জন মুসলিম মনীষীর বাণী** হলো–

ইমাম গাজ্জালি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "অলসতা হলো আত্মার রোগ; এর চিকিৎসা হলো উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা।"

শেখ সাদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যে ব্যক্তি শ্রম করে না, সে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়।"

কর্মের অপারগতার বাস্তব জীবনে উদাহরণ :

★ **শিক্ষার্থী জীবনে বিলম্ব :** একজন ছাত্র পরীক্ষার আগে সবসময় বলে– "এবার আমি নিয়মিত পড়বো।" কিন্তু বাস্তবে সে প্রতিদিন পড়াশোনায় দেরি করে, অল্প কাজ করে, পরে বলে "সময় পাইনি"। ফলস্বরূপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। এখানে মূল সমস্যা কাজ শুরু না করা, ফলে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ফলাফল পাওয়া যায় না।

★ **ব্যবসায় সুযোগ হারানো :** কেউ একটি ব্যবসার সুযোগ পেলো, পুঁজি ও পরিকল্পনা দুই-ই আছে, কিন্তু সে ভয়, দ্বিধা ও বিলম্বের কারণে পদক্ষেপ নেয়নি। অন্য কেউ এগিয়ে গিয়ে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফেলল। অক্ষমতা এসেছে সাহস ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের অভাব থেকে।

★ **ধর্মীয় কর্ম পিছিয়ে দেওয়া :** অনেকেই সালাত বা কুরআন শিক্ষার কথা মনে রাখে, কিন্তু "কাল থেকে করবো" বলতে বলতে বয়স পার হয়ে যায়। জীবনে হয়তো সময় বা শক্তি ছিল, কিন্তু আলস্য ও টালবাহানার কারণে 'ইবাদতের সুযোগ হারায়। জীবনের অনেক সুযোগ একবারই আসে, তখন অক্ষমতা মানেই স্থায়ী ক্ষতি। বাস্তব জীবনে দেখা যায়, অধিকাংশ "অক্ষমতা" আসলে দেহের নয়, মনের দুর্বলতা ও অজুহাত তৈরির কারণে হয়।

"কর্মের অপারগতা" শুধু অলসতা নয়; এটি হলো সাহস, ধৈর্য ও উদ্যোগের অভাবের ফল। বাস্তব জীবন ও ইসলামের শিক্ষা বলে– যদি তোমার কাছে সুযোগ, শক্তি ও সময় থাকে, তবে দেরি না করে উদ্যোগ নাও; কারণ আগামীকাল হয়তো সেই সুযোগ থাকবে না। কর্মে অপারগতা ব্যক্তিকে শুধু পিছিয়ে দেয় না; বরং পুরো জাতিকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। কুরআন ও হাদীস স্পষ্টভাবে সক্রিয় জীবন, পরিশ্রম ও প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছে। ইতিহাসে যে জাতি কর্মে অপারগ হয়েছে, তারা হারিয়েছে স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও মর্যাদা। তাই প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে অপারগতা দূর করে কর্মঠ হতে হবে। ⊠

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নিভৃত ভাবনা

মৃত্যুর প্রস্তুতিতে তাওবাহ্-ইস্তিগফার

–জান্নাতুল মহল

তাওবাহ্ অর্থ ফিরে আসা এবং ইস্তেগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। যে কোনো পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনা করা ও সেই পাপ আর করব না বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করার নাম তাওবাহ্। আর মহান আল্লাহর নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম ইস্তিগফার। সাধারণভাবে তাওবাহ্ ও ইস্তেগফার একসাথে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাওবাহ্-ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মু'মিনের আন্তরিক অনুশোচনা, অনুতাপ ও পুনরায় এটা আর না করার আন্তরিক ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত।

তাওবাহ্ ও ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্তই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়, সফলকাম হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১০৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا﴾

"যারা তাওবাহ্ করবে, ঈমান আনবে আর নেক 'আমল করবে অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন এবং আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১০৯]

মৃত্যুর প্রস্তুতিতে বা আখিরাতের প্রস্তুতিতে একটা বড় প্রস্তুতি হলো তাওবাহ্ বা ইস্তেগফার : কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার নাম তাওবাহ্। দুনিয়ার সকল মানুষ কোনো না কোনোভাবে পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়ে; বরং পাপকর্মে লিপ্ত হওয়াটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। এদের মধ্যে যারা তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অন্যায় উপলব্ধি করতে পারে, নিজেকে পবিত্র করার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফিরে যায় বা তাওবাহ্ করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম। তারাই সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾

"নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে বসে, তৎপর সত্বর তাওবাহ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ্ আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী।"[১১০]

পবিত্র কুরআনে **মহান আল্লাহর বান্দাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ** করা হয়েছে–

১) তাওবাহ্কারী : তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বলেছেন, মু'মিন বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার মু'মিন বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন– তারা যেন তাওবাহ্ করে। তিনি বলেন,

﴿وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১১১]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا﴾

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধভাবে তাওবাহ্ করো।"[১১২]

২) অত্যাচারী : যারা তাওবাহ্ করে না তারা অত্যাচারী। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা যালিম বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ﴾

"যারা তাওবাহ্ করে না তারা যালিম (অত্যাচারী)।"[১১৩]

---

[১০৮] *সূরা আন্-নূর : ৩১।*
[১০৯] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন : ৭০।*
[১১০] *সূরা আন্-নিসা : ১৭।*
[১১১] *সূরা আন্-নূর : ৩১।*
[১১২] *সূরা আত্ তাহরীম : ৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

তাওবাহ্ করার সুযোগ : আল্লাহ তা'আলা তাওবার জন্য আমাদের সুযোগ দিয়েছেন।

প্রথম সুযোগ হচ্ছে– কেরামান কাতেবীন (সম্মানিত লেখক ফেরেশ্তাকুল, মালাইকা) 'আমল লেখার পূর্বেই সময় পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বাম দিকের মালাক পাপকারী মুসলিম বান্দার থেকে ৬ (ছয়) ঘণ্টা কলম উঠিয়ে রাখেন, অতঃপর সে যদি অনুতপ্ত হয় এবং মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে মালাক কলম ফেলে দেন এবং তার পাপটুকু লেখেন না।। অন্যথায় একটি পাপ লিখা হয়।[১১৪]

অপর সুযোগটি হলো– পাপকারীর পাপ লেখার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেয়া হয়।

তাওবাহ্ কবুল হওয়ার শর্ত : তাওবাহ্ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সারমর্ম অত্যন্ত গভীর। কুরআন হাদীস থেকে এর জন্য কয়েকটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। শর্ত হলো–

প্রথম শর্ত : তাৎক্ষণিক পাপকাজ হতে বিরত হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত : কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

তৃতীয় শর্ত : ভবিষ্যতে উক্ত কাজে কখনো লিপ্ত হবে না এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া।

চতুর্থ শর্ত : হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার। কারো প্রতি অন্যায় করে থাকলে তার কাছে তার অধিকার প্রত্যর্পণ করা অথবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া।

কিভাবে তাওবাহ্ করব?

পাপকর্ম পরিত্যাগ করে নিম্নলিখিত দুইটি কাজ করা উচিৎ। যথা-

প্রথমতঃ অন্তরের কাজ– তা হলো আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং পুনরায় উক্ত কাজে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অনুতাপ, অনুশোচনাই হলো প্রকৃত তাওবাহ্।[১১৫]

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ– তা হলো বিভিন্ন ধরনের সৎকর্মে লিপ্ত হওয়া। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সালাতুত্ তাওবাহ্ বা তাওবার সলাত।

আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপকর্ম করে ফেলে, অতঃপর সে পাক-পবিত্র হয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।[১১৬]

সৎকর্মের আরো কয়েকটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি :

১) কোনো ব্যক্তি যদি বিস্মিল্লা-হ বলে উত্তমভাবে ওযূ করে এবং ওযূর প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করে, এতে যৌথ অঙ্গের পাপসমূহ পানির সাথে ঝরে পড়ে।[১১৭]

২) ওযূর পর এই দু'আ পড়বে– আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।[১১৮]

৩) আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাওয়া-বীনা ওয়াজ 'আলনী মিনাল মুতাত্বহহিরীন। **অর্থ :** হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাহ্কারীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতাকারীগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।[১১৯]

কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবো?

ইস্তেগফার অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনা করা। মু'মিন যে কোনো ভাষায় বা যে কোনো বাক্যে যে কোনো সময় মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন। তবে কুরআন ও রাসূল (ﷺ)-এর শেখানো বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। ইস্তিগফার মহান আল্লাহর অন্যতম যিক্র।

১. সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার– সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ : রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি এ ইস্তিগফারটি সকালে বিশ্বাসের সাথে পাঠ করবে তার যদি সেদিন মৃত্যু হয় তাহলে ইন্ শা-আল্লাহ সে জান্নাতী হবে। রাতে পড়লে রাতে মৃত্যু হলে ইন্ শা-আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতী করবেন।[১২০]

---

[১১৩] *সূরা আল-হুজুরা-ত : **১১**।*
[১১৪] *সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. **১২০৯**।*
[১১৫] *আহমদ; সুনান ইবনু মাজাহ্; সহীহুল জামে' - হা. ৬৮০২।*
[১১৬] *আত্ তিরমিযী; আবূ দাঊদ; আন্ নাসায়ী; ইবনু মাজাহ্।*
[১১৭] *সহীহ মুসলিম- ওযূ অধ্যায়।*
[১১৮] *সহীহ মুসলিম।*
[১১৯] *জামে' আত্ তিরমিযী।*
[১২০] *সহীহুল বুখারী।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

"اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ".

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি লা- ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আব্দুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বাতু আ'উজুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনূবা ইল্লা আন্তা।

১) আস্তাগফিরুল্লাহ– **অর্থ :** আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রত্যেক সলাতের পর ৩ বার। সাজদায়, দুই সাজদার মাঝে, এছাড়াও যে কোনো সময় এই যিক্‌র করা যায়।

২) রব্বিগফিরলী ওয়া তুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্তাউয়াবুল গাফুর। **অর্থ :** "হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ্‌ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহান তাওবাহ্‌ কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।

৩) আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা- ইলাহা ইল্লাহুআল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি। **অর্থ :** 'আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবাহ্‌ করছি'।[১২১]

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি দিনে ৭০ বারের বেশি আল্লাহর নিকট তাওবাহ্‌ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।[১২২]

কুরআনে মু'মিনগণকে বারংবার তাওবাহ্‌ ও ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

"কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুল-ত্রুটির জন্য আর মু'মিন ও মু'মিনাদের জন্য, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে অবগত।"[১২৩]

[১২১] *সুনান আবূ দাউদ ও জামে' আত্‌ তিরমিযী।*
[১২২] *সহীহুল বুখারী।*
[১২৩] *সূরা মুহাম্মদ : ১৯।*

অতএব, নিজের জন্য ও মু'মিন মু'মিনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রথমে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা :

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ﴾

"হে আমার প্রতিপালক। ক্ষমা করো ও রহম করো, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১২৪]

নিজের জন্য, বাবা-মার জন্য ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : "রব্বানাগফির লী ওয়া লি ওয়ালি দাইয়্যা ওয়াল্লিল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকুমুল হিসাব।"

অর্থ : "হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব হবে, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দাও।"[১২৫]

সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা : আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

উচ্চারণ : "আল্লাযিনা জা-উ মিম বা'দেহিম ইয়াক্কুলুনা, রব্বানাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনা আল্লাজিনা সাবাক্কুনা বিল ঈমানী, ওয়া লা তাজআল ফি ক্কুলুবিনা গিল্লান লিল্লাজিনা আমানু, রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম।"

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং মু'মিনদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"[১২৬]

নিজের জন্য, বাবা-মার জন্য আর মু'মিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা :

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا﴾

"হে আমার রব! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে যারা আমার গৃহে মু'মিন হয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।"[১২৭]

[১২৪] *সূরা আল-মু'মিনূন : ১১৮।*
[১২৫] *সূরা ইব্‌রা-হীম : ৪১।*
[১২৬] *সূরা আল হাশ্‌র : ১০।*
[১২৭] *সূরা নূহ্‌ : ২৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মাজলিস শেষে ক্ষমা প্রার্থনা : প্রত্যেক মাজলিসে অর্থাৎ- যেখানে কুরআন পাঠ করা হয়, শিক্ষা দেয়া হয় এবং কুরআন ও হাদীস নিয়ে আলোচনা হয়, সেই মাজলিসের শেষে ক্ষমা প্রার্থনা বা দু'আ করা। যেমন-

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওরাতূবু ইলাইকা।"

তাহলে তার ফল হবে– তার পূর্বকৃত যাবতীয় পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হবে।[১২৮]

রাসূল (ﷺ) বলেন, "মাজলিস ভঙ্গের পূর্বে এই দু'আ পাঠ করলে মাজলিস চলাকালীন তার ভালো কথাগুলো তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মোহরাঙ্কিত থাকবে ও অযথা বাক্যসমূহের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং এই দু'আ উক্ত গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা হবে।"[১২৯]

আসুন! **আদম** (আলায়হিস সালাম) **ও বিবি হাওয়া** (আলায়হিস সালাম)**-এর** মতো আমরাও **ক্ষমা প্রার্থনা** করি–

﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো আর দয়া না করো তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।"[১৩০]

'ইউনুস (আলায়হিস সালাম)**-এর** মতো আমরাও **ক্ষমা প্রার্থনা** করি–

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তোমারই পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা করছি; বাড়াবাড়ি আমিই করেছি।"[১৩১] আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করো– আন্তরিক তাওবাহ্। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে তোমাদের থেকে মুছে দেবেন, আর তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে ঝর্ণাধারা। সেদিন আল্লাহ নবীকে আর তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। (সেদিনের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে মু'মিনদের রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে তাদের সামনে আর তাদের ডান পাশে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও আর আমাদেরকে ক্ষমা করো; তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৩২]

আসুন, নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে **মৃত্যুর প্রস্তুতিতে** আমরা আল্লাহর কাছে এভাবে **দু'আ** করি–

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

অর্থ : "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো'। সে অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করো এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত করো আর নেক বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।"[১৩৩] –আল্লাহুম্মা আমীন। ⊠

দু'আর আবেদন

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি হাফেয মো. ওয়াসিম উদ্দিন সজিব-এর বাবা দীর্ঘ দিন থেকে অসুস্থ। তিনি বর্তমানে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন –আমীন, ইয়া রাব্বিল 'আলামীন।

«اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বান নাসি উজহিবাল বা'সি, ইশফিহি ওয়া আনতাশ-শাফি, লা শিফায়া ইল্লা শিফায়ুকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকমা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৪৩)*

[১২৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৪৪; জামে' আত্ তিরমিযী- ১/৭৮, হা. ৫৫; সহীহ আত্ তারগীব- ১/১৬৬।*

[১২৯] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৬৭; সুনান আন্ নাসায়ী; সুনান ইবনু মাজাহ্- অধ্যায় : ৯. দু'আসমূহ।*

[১৩০] *সূরা আল-আ'রাফ : ২৩।*

[১৩১] *সূরা আল-আম্বিয়া- : ৮৭।*

[১৩২] *সূরা আত্-তাহ্রীম : ৮।*

[১৩৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের অবদান

–ইসরাত পারভীন মৌসুমী*

ভূমিকা : আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে জাতি বিজ্ঞানে যত উন্নত, সে জাতি তত বেশি সভ্য ও শক্তিশালী। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বোঝায়। আর এই বিজ্ঞানের প্রযোজ্য প্রয়োগই হলো প্রযুক্তি। বিজ্ঞান যেখানে প্রকৃতির নিয়মাবলিকে উন্মোচন করে, প্রযুক্তি সেখানে সেই নিয়মকে কাজে লাগিয়ে মানব কল্যাণে নতুন নতুন যন্ত্র ও কৌশল উদ্ভাবন করে। বর্তমান যুগকে তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র– শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগ, বিনোদন– আজ বিজ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ ও সহজতর হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান : শিক্ষার প্রসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রাচীনকালের হাতে লেখা পুঁথি থেকে আজকের ডিজিটাল ক্লাসরুম পর্যন্ত এই যাত্রার পুরোটাই বিজ্ঞানের অবদান। ছাপাখানার আবিষ্কার জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বই, খাতা, কলম থেকে শুরু করে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর –সবই বিজ্ঞানের দান। আজ ঘরে বসেই বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাইব্রেরিতে প্রবেশ করা সম্ভব, অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করা যায়। ই-বুক, অডিওবুক, শিক্ষামূলক অ্যাপস এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিক্ষাকে আরো আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য করে তুলেছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময় অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়েছে কেবল প্রযুক্তির কল্যাণে। বিজ্ঞান শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান : "Health is wealth" বা "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল" –এই প্রবাদটির বাস্তব রূপায়ণে বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। একসময় কলেরা, বসন্ত, প্লেগের মতো মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। মানুষ অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন ও প্রতিষেধক। আজ বসন্ত ও পোলিওর মতো রোগ পৃথিবী থেকে প্রায় নির্মূল। অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান এনেছে অভাবনীয় সাফল্য। এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই-এর মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ছবি দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, স্টেম সেল থেরাপি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং রোবটিক সার্জারির মতো উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি মানুষের গড় আয়ু বাড়াতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ মানুষ অনেক জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করতে সক্ষম।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান : জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান আমাদের প্রধান হাতিয়ার। সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদে যেখানে উৎপাদন ছিল সীমিত, সেখানে আধুনিক বিজ্ঞান এনেছে 'সবুজ বিপ্লব'। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং আধুনিক সেচব্যবস্থা খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি কৃষিকাজকে অনেক সহজ ও দ্রুততর করেছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে, যা খরা, লবণাক্ততা ও রোগ প্রতিরোধী। টিস্যু কালচারের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে উন্নত মানের চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এক কথায়, বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ কোটি কোটি মানুষের মুখে অন্ন ওঠছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের অবদান : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। প্রাচীনকালে যেখানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবর পাঠাতে ঘোড়া বা পায়রার ওপর নির্ভর করতে হতো, সেখানে আজ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে আজকের মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট– এ সবই বিজ্ঞানের অবদান। ইন্টারনেটের আবিষ্কার গোটা বিশ্বকে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা 'বৈশ্বিক গ্রামে' পরিণত করেছে। সামাজিক

* *জুরাইন, ঢাকা।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আমরা ভৌগোলিক দূরত্বকে জয় করেছি। সড়ক, রেল, নৌ এবং আকাশপথে দ্রুতগামী যানবাহন চলাচল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে সহজতর করেছে।

দৈনন্দিন জীবনে ও বিনোদনে বিজ্ঞান : আমাদের ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন– এ সবকিছু আমাদের জীবনকে আরামদায়ক করেছে। আমরা যে পোশাক পরি, যে বাড়িতে বাস করি, তার নির্মাণেও রয়েছে বিজ্ঞানের ছোঁয়া। বিনোদনের জগতেও বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য। সিনেমা, টেলিভিশন, কম্পিউটার গেমস, স্মার্টফোনের বিভিন্ন অ্যাপস আমাদের অবসরের সঙ্গী। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা ঘরে বসেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের খেলাধুলা, সঙ্গীত বা চলচ্চিত্র উপভোগ করতে পারি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার : প্রতিটি আবিষ্কারের মতোই এরও একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। বিজ্ঞান মানবজাতির জন্য যেমন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে, তেমনই এর অপব্যবহার অভিশাপও ডেকে আনতে পারে। পারমাণবিক বোমার মতো মারণাস্ত্রের আবিষ্কার পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মতো ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রযুক্তির প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সাইবার ক্রাইম, অনলাইন প্রতারণা, ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের মতো ঘটনাগুলো প্রযুক্তির অন্ধকার দিককে তুলে ধরে।

উপসংহার : বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। এটি আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে এসেছে, আমাদের জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ, সুন্দর ও গতিময়। তবে মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানের ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার ব্যবহারকারীর ওপর। আমরা যদি বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করি, তবে এটি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে। আর যদি এর অপব্যবহার করি, তবে তা ডেকে আনবে মানবজাতির ধ্বংস। তাই আমাদের উচিত বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বিবেক ও বিচক্ষণতার সাথে মানবজাতির সার্বিক মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার মাধ্যমেই আমরা একটি সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দিতে পারি। ☒

মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ

পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
www.mdhsbd.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত "মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ"-এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

ক্র:	পদ	পদ সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পাঠদানের স্তর	অভিজ্ঞতা
১	সহকারী শিক্ষক (আরবী)	১ জন	দাওরা হাদীস/ সমমান	কুল্লিয়া স্তরে পাঠ দানে সক্ষম	অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ২৪ আগষ্ট ২০২৫ইং, রোজ: রবিবার, সকাল: ১০ ঘটিকায় মাদ্রাসার অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য আহবান করা হলো।

প্রয়োজনে:
01734474256/ 01641096816

অধ্যক্ষ
মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্‌

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কিশোর ভুবন

মাকড়সা ও মহান আল্লাহর ওপর ভরসা

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

শীতকাল। আবহাওয়া অনুকূলে। ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই ঋতুটি সত্যিই খুব উপযুক্ত। আব্দুল্লাহ সাহেব পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। গ্রামের মসজিদে 'আসরের সলাত শেষ করে তিনি বসে আছেন। ওযূখানার দিকে নজর পড়তেই দেখলেন, এক মাকড়সা আপন মনে জাল বুনছে। সেটাই তার বাড়ি– যেখানে সে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ বোধ করে।

আব্দুল্লাহ সাহেব গভীর মনোনিবেশে মাকড়সার জাল বোনা দেখছেন আর ভাবছেন– মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্য কত কিছু না করে! মজবুত লোহার দরজা, কয়েক স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা বেষ্টনী, সিসি ক্যামেরার নজরদারি– আরো কত কিছু! অথচ এই দুর্বল মাকড়সাটি নিজের বোনা নিপুণ জালেই নিশ্চিন্তে বসবাস করছে। সে ভাবছে না, একটু জোরে বাতাস এলে তার ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে! কিন্তু সে একটুও চিন্তিত নয়। কারণ সে তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে। ইতোমধ্যে হিফযখানার কয়েকজন ছাত্র এসে জিজ্ঞেস করল–

হিফ্যখানার ছাত্র : চাচা, আপনমনে ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছেন?

আব্দুল্লাহ সাহেব : মাকড়সার জাল বোনা দেখছি আর ভাবছি।

হিফ্যখানার ছাত্র : কী ভাবছেন, চাচা?

আব্দুল্লাহ সাহেব : ভাবছি, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আছে, কিন্তু নির্বোধের মতো নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।

হিফ্যখানার ছাত্র : কীভাবে?

আব্দুল্লাহ সাহেব : মানুষ নিরাপদে থাকার জন্য কত কিছু করে! মজবুত বাড়ি তৈরি করে, উঁচু করে দেয়াল তোলে, নানা ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে! তার ওপর সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সর্বক্ষণ নজর রাখে! তারপরও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, ভেতরেই এক ভয় আর শঙ্কা কাজ করে।

হিফ্যখানার ছাত্র : এতে সমস্যা কোথায়?

আব্দুল্লাহ সাহেব : সমস্যা হলো মানুষ মহান আল্লাহর ওপর ভরসা না করে, নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েছে। তাই এত মজবুত নিরাপত্তার বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতায় কষ্ট পায়।

হিফ্যখানার ছাত্র : তাহলে আমাদের করণীয় কী?

আব্দুল্লাহ সাহেব : দুর্বল প্রাণী মাকড়সা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

হিফ্যখানার ছাত্র : কী শিক্ষা?

আব্দুল্লাহ সাহেব : সেটি আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন।

হিফ্যখানার ছাত্র : কুরআনে মাকড়সার কথা বলা হয়েছে?

আব্দুল্লাহ সাহেব : হ্যাঁ! তোমরা যে কুরআন হিফয করছ, তাতে মাকড়সা নামে একটি সূরার নামকরণ হয়েছে –সূরা আল-'আনকাবূত।

হিফ্যখানার ছাত্র : কুরআনে মাকড়সা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

আব্দুল্লাহ সাহেব : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের অবস্থা মাকড়সার মতো, যে একটি ঘর তৈরি করে; আর ঘরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ঘর হলো মাকড়সার ঘর– যদি তারা জানত!"[১৩৪]

হিফ্যখানার ছাত্র : এই আয়াত দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

আব্দুল্লাহ সাহেব : দেখো, মাকড়সা নিজে দুর্বল প্রাণী, আর তার ঘর আরো দুর্বল। একটু শক্ত বাতাস এলে ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তবু সে চিন্তিত নয়। এই দুর্বল ঘরেই সে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসবাস করে। আর তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন।

অপরদিকে, মানুষ এত মজবুত বাড়ি বানায়, নিরাপত্তাবলয় তৈরি করে, তারপরও এক মুহূর্তে সবকিছু হারিয়ে ফেলে– যেমন তাসের ঘর ভেঙে যায়।

হিফ্যখানার ছাত্র : যদি দুর্বল মাকড়সা আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারে, তাহলে বিবেকবান মানুষ কেন পারে না?

আব্দুল্লাহ সাহেব : আসল কথা হলো আমাদের ঈমানের দুর্বলতা। আমরা জানি, সকল নিরাপত্তার কেন্দ্র আল্লাহ, কিন্তু ঈমানের দুর্বলতার কারণে বিশ্বাস রাখতে পারি না। আবার আমরা তাকদীরে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই বিশ্বাসও দুর্বল; তাই এত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ।

সবশেষে, আমাদের ঈমান যত দৃঢ় হবে, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি যত বেশি হৃদয়ে বাস করবে, ততোই আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শিখব। আর যখন মহান আল্লাহর ওপর ভরসা পূর্ণ হবে, তখন দুশ্চিন্তা থাকবে না, ভয় থাকবে না, শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারব। ☒

---

[১৩৪] *সূরা আল-'আনকাবূত : ৪১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : *মুসল্লি নামাযের নিয়ত করার পর কোথায় হাত রাখবে?* *মোস্তাকিম আহমেদ এরিক, কাহেৎটুলী, ঢাকা।*

জবাব : সালাতের নিয়ত করার পর উভয় হাত রাখার স্থান সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর স্থাপন করতেন। *(সুনান আবূ দাঊদ; সুনান আন্ নাসায়ী)* বুকের ওপর হাত রাখাটাই সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«صَلَّيْت مَعَ رَسُوْلَ الله (ﷺ) فَوَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَدْه الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِه».

“আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রেখে বুকের ওপর স্থাপন করেছেন।” *(সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ৪৭৯)* নাভীর নিচে হাত রাখার হাদীসসমূহ সহীহ নয়।

জিজ্ঞাসা (০২) : *রফউল ইয়াদাইন করার হুকুম কী?*
রায়হান আহমেদ অমিত, সিক্কাটুলী, ঢাকা।

জবাব : নামাযে চার স্থানে রফউল ইয়াদাইন করার কথা এসেছে। স্থানগুলো হচ্ছে– (১) নামাযের শুরুতে তাকবীর তাহরিমা বলার সময়, (২) রুকূ‘তে যাওয়ার সময়, (৩) রুকূ‘ থেকে ওঠার সময়, (৪) প্রথম তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাক‘আতে ওঠার সময়। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ চারটি স্থানের বিষয়ে নবী (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস এসেছে। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كان النبي (ﷺ) يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كبرللصلاة وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

“নবী (ﷺ) যখন আল্লাহু আকবার বলে নামাযে দাঁড়াতেন তখন রফউল ইয়াদাঈন করতেন, যখন রুকূ‘র জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে রুকূ‘ থেকে মাথা ওঠাতেন তখনও হাত ওঠাতেন। ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সিজদায় যাওয়া কিংবা তা থেকে মাথা ওঠানোর সময় তিনি এরূপ করতেন না।” *(বুখারী- কিতাবুল আযান)*

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (ﷺ)-এর ‘আমলসমূহ অনুসন্ধান করতেন। তিনি নামাযে তার ‘আমলসমূহ অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন যে, রাসূল (ﷺ) তাকবীরে তাহরিমা, রুকূ‘তে যাওয়া, রুকূ‘ থেকে ওঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে ওঠার সময় রফউল ইয়াদাঈন করছেন। আর তিনি বলেছেন, নবী (ﷺ) সিজদার সময় রফউল ইয়াদাঈন করতেন না। এরকম বলা ঠিক হবে না যে, সিজদার সময় রফউল ইয়াদাঈন করা ও না করার বিষয়টি একই বিষয়ে নফী ও ইসবাত তথা সাব্যস্তকরণ ও নাকচ করার মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যারা সিজদার সময় রফউল ইয়াদাঈন সাব্যস্ত করেছেন তাদের কথা সেটা নাকচকারীদের কথার ওপর প্রাধান্য পাবে। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র হাদীসে। তিনি জোর দিয়ে সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সিজদার সময় হাত ওঠানোর অবস্থাগুলো দেখেননি। যে ব্যক্তি তাঁকে রুকূ‘তে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাঈন করতে দেখবেন, রুকূ‘ হতে মাথা ওঠানোর সময় তা করতে দেখবেন অতঃপর বলবেন তিনি সিজদায় অনুরূপ করতেন না, তার ব্যাপারে কি আমরা বলতে পারি যে, তিনি কিছু কিছু স্থানে রফউল ইয়াদাঈন করার কথা বর্ণনা করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন এবং তা খেয়াল করতে পারেননি? এটি সম্ভব নয়। কেননা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, নবী কারীম (ﷺ) সিজদায় যাওয়া কিংবা তা থেকে মাথা ওঠানোর সময় রফউল ইয়াদাঈন করতেন না। একই সঙ্গে জোর দিয়ে বলেছেন যে, রুকূ‘তে যাওয়ার সময় এবং তা থেকে মাথা ওঠানোর সময় রফউল ইয়াদাঈন করতেন।

আর জানাযা ও দুই ঈদের নামাযে রফউল ইয়াদাঈন করার ব্যাপারে কথা হলো প্রত্যেক তাকবীর বলার সময়ই তা শরীয়ত সম্মত।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *দু‘আ কুনূত পাঠ করার সময় হাত ওঠানো কি সুন্নাত? দলিলসহ জানাবেন।* *হারুন-উর-রশিদ, ঝিনাইদহ।*

জবাব : হ্যাঁ, সুন্নাত হলো দু‘আ কুনূত পাঠ করার সময় উভয় হাত ওঠানো। কেননা নবী কারীম (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিপদ-আপদ এলে ফর্য নামাযে কুনূত পাঠ করার সময় উভয় হাত ওঠাতেন। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীরুল মু’মিনীন ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিত্র নামাযে দু‘আ কুনূত পড়ার সময় হাত ওঠাতেন। তিনি ছিলেন খোলাফা রাশেদার মধ্যে অন্যতম। তাদের অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

অতএব বিত্র নামাযে কুনূতের সময় হাত ওঠানো সুন্নাত। চাই ইমাম হয়ে বিতর নামায আদায় করুক বা মুক্তাদী হয়ে আদায় করুক কিংবা একাকী আদায় করুক। আপনি যখনই কুনূত পড়বেন তখনই আপনার উভয় হাত ওঠাবেন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৫ আগস্ট- ২০২৫ ঈ. ❖ ০১ রবিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

মসজিদ বাব আল সালাম, ওমান

মরুর বুকে শান্তির আধুনিক মরূদ্যান

–আবু ফাইয়াজ জি. রহমান

ওমানের রাজধানী মাসকাটের এক শান্ত ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকায় অবস্থিত বাব আল সালাম মসজিদ (Bab Al Salam Mosque) ইসলামী স্থাপত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। উদ্বোধনের পর থেকে এটি শুধুমাত্র সালাতের স্থান নয়; বরং শিল্প, ঐতিহ্য, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক সম্প্রীতির এক অনন্য প্রতীক হয়ে ওঠেছে। মসজিদের নামের অর্থ "শান্তির দ্বার", আর নকশা ও পরিবেশ– সবই যেন সেই শান্তির মর্মার্থকে ছুঁয়ে যায়। এই মসজিদটি কেবল প্রার্থনার স্থান নয়; এটি আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যের এক সৃজনশীল পরীক্ষা, যেখানে ঐতিহ্য, সরলতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং আধ্যাত্মিকতার নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটেছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ওমান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামী স্থাপত্যে নিজস্ব ধারা ধরে রেখেছে। মধ্যযুগে এখানে গড়ে ওঠা মসজিদগুলোতে দেখা যেত সরল কিন্তু শক্তপোক্ত স্থাপত্য, যেখানে স্থানীয় পাথর, চুনাপাথর এবং কাঠ ব্যবহার করা হতো। সুলতান কাবুস বিন সাঈদের শাসনামলে (১৯৭০-২০২০) দেশজুড়ে আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে ইসলামী ঐতিহ্যও নতুন রূপে ফিরে আসে।

বাব আল সালাম মসজিদ সেই ধারাবাহিকতারই ফল, যেখানে প্রাচীন ওমানি স্থাপত্যশৈলীর সরলতা এবং ২১শ' শতকের প্রযুক্তি ও নান্দনিকতা মিলেমিশে এক নতুন ধারা তৈরি করেছে। এটি নির্মাণে স্থানীয় সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি ওমানের বিশ্বমঞ্চে স্থাপত্যশিল্পের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

স্থাপত্যের শিল্প ও বৈশিষ্ট্য : বাব আল-সালাম মসজিদের নকশা করেছেন ওমানি স্থপতি মারওয়ান আল বালুশি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান Altqadum. প্রকল্পটির সূচনা ২০১৮ সালে হলেও এর পথ সহজ ছিল না– স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে এর ব্যতিক্রমী নকশা অনুমোদন দিতে দ্বিধা করে। কারণ, এটি প্রচলিত গম্বুজ ও মিনারের ধারা ভেঙে নিয়ে আসে এক নতুন ভিজ্যুয়াল ভাষা। তবে নকশার নান্দনিকতা, কার্যকারিতা এবং স্থানীয় আবহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপস্থাপন শেষ পর্যন্ত এটিকে অনুমোদন এনে দেয়। ২০২৩ সালে এটি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং ২০২৪ সালে Time Magazine-এর "World's Greatest Places" তালিকায় স্থান পায়।

স্থাপত্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য–

০১. আকৃতি ও বিন্যাস : মসজিদের প্রধান অংশটি গোলাকার, ব্লাশ-টোন (হালকা গোলাপি) কাঠামোয় গড়া, যা মরুভূমির প্রাকৃতিক রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেন্দ্রে খোলা আঙিনা, চারপাশে জলছক, যা তাপ কমায় ও নান্দনিকতা বাড়ায়।

০২. মিনার ও মিহরাবের নতুন ব্যাখ্যা : একক শঙ্কু আকৃতির মিনারের মাথায় সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা ক্রিসেন্ট। প্রচলিত মিহরাবের পরিবর্তে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা কাচের জানালা কিবলা নির্দেশ করে, যাতে আলো ও দৃষ্টির খোলামেলা প্রবাহ বজায় থাকে।

০৩. আলোকসজ্জা : প্রধান হল ঘিরে আছে ১,৬০০'রও বেশি ক্রিস্টাল ল্যাম্প। দিনের আলো ভেতরে এসে এগুলোতে প্রতিফলিত হয়ে স্থানে অপার্থিব দীপ্তি ছড়ায়।

০৪. পরিবেশ সচেতনতা : Cobiax প্রযুক্তি দিয়ে ছাদ নির্মাণে কংক্রিটের ওজন কমানো হয়েছে। ওযূর পানি পুনঃব্যবহার করে বাগান সেচ। স্থানীয় পাথর, মার্বেল ও উপাদান ব্যবহার –যাতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : বাব আল-সালাম মসজিদ স্থানীয় কমিউনিটির জন্য শুধু 'ইবাদতের স্থান নয়; বরং এক মিলনমেলা। শুক্রবারের খুত্ববাহ, রমাযানের ইফতার আয়োজন এবং ঈদের নামাযে এলাকাবাসী একত্রিত হয়। স্থাপত্যের খোলা নকশা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ শিশু, পরিবার ও বৃদ্ধদের জন্য সমান স্বাচ্ছন্দ্যময়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি : ২০২৪ সালে টাইম ম্যাগাজিন একে বিশ্বের "Top 100 Places to Visit" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ্বজুড়ে স্থপতি ও সমালোচকরা একে আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেখানে ঐতিহ্য, প্রকৃতি ও প্রযুক্তি একত্রে স্থান পেয়েছে।

আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য : বাব আল-সালাম মসজিদ প্রার্থনার সময় ভেতরের নীরবতাকে অগ্রাধিকার দেয়। মিনিমালিজমে ভর করে তৈরি হওয়ায় এখানে কোনো বাড়তি অলংকার নেই; বরং আলো, বায়ু ও স্থানীয় উপকরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই হয়ে ওঠেছে প্রধান নান্দনিক উপাদান। এই ধারণাটি ইসলামী আধ্যাত্মিকতার সেই মূল তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়, যা সরলতায় গভীরতা খোঁজে।

পরিশেষে বলা যায়, বাব আল-সালাম মসজিদ আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। এখানে প্রযুক্তি, নকশা, ঐতিহ্য, পরিবেশ সচেতনতা এবং সামাজিক সংহতি –সব মিলেই তৈরি হয়েছে শান্তির এক আশ্রয়স্থল। ওমান ভ্রমণে এটি শুধু দেখার মতো স্থান নয়; বরং অনুভব করার মতো একটি অভিজ্ঞতা, যা দর্শকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। ☒

সূচীপত্র

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (সেপ্টেম্বর-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	'ঈশা
০১	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০২	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ২৫	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১
০৪	০৪ : ২৫	০৫ : ৪১	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ৩০
০৫	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১২	০৭ : ২৯
০৬	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১১	০৭ : ২৮
০৭	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ১০	০৭ : ২৭
০৮	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৪	০৬ : ০৯	০৭ : ২৬
০৯	০৪ : ২৮	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৫
১০	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১১	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১৩	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
১৪	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
১৫	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
১৬	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	০৩ : ২০	০৬ : ০১	০৭ : ১৭
১৭	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
১৮	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
১৯	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৩
২০	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২১	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৬	০৭ : ১১
২২	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৫	০৭ : ১০
২৩	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৪	০৭ : ০৯
২৪	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৬	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৮
২৫	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৬	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭
২৬	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫১	০৭ : ০৬
২৭	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৪	০৫ : ৫০	০৭ : ০৫
২৮	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৪
২৯	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৩
৩০	০৪ : ৩৬	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৭	০৭ : ০২

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. **25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

HAS

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice